উপনিবেশ

প্রথম পর্ব

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা

দুই টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

নৃত্যশিল্পী

বুলবুল চৌধুরী এম-এ

প্রিয়বরেষু

উপনিবেশ প্রথম পর্ব ১৩৪৮ সালে রচিত এবং ১৩৪৯—৫০-এ ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার পরেই বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাকার অগ্রজপ্রতিম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহ-লিপিতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। কবি-সুহৃদ জগদীশ ভট্টাচার্য (কলেজ বয়), চির-হিতৈষী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভারতবর্ষ সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাভাজন ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও বহুবিধ উৎসাহ ও সহায়তা পাই। আমার প্রথম উপন্যাসে এই শুভার্থীদের ঋণভার সাদরে ও সগৌরবে বহন করছি।

বন্ধু সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বান্ধবী আশা সান্যালকেও নানাদিক থেকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জলপাইগুড়ি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উপনিবেশ

মৃত্তিকা

পৃথিবী বাড়িতেছে।

দিনের পর দিন নদীর মোহানা-মুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে আর ক্রমে ক্রমে সেই স্তরের উপর দিয়া সুন্দরবন প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।

আবার ওদিকে যখন মেঘনার কালো জলে কল্ কল্ করিয়া ঘূর্ণি ঘুরিতে থাকে, আকাশের একপ্রান্তে এতটুকু একটু বৈকালী মেঘ দেখিয়াই বৈশাখী নদী ইলসা উদ্দাম হইয়া উঠে, তেঁতুলিয়ার মুখ দিয়া যখন পাহাড়ের মতো খাড়া হইয়া দুর্জয় বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসে, তখনো সেই মৃত্যু-তরঙ্গের নিভৃত তলাটিতে বসিয়া জীবন-কীট অন্ধ-প্রেরণায় রচনা করিয়া চলে। দেখিতে দেখিতে অতলস্পর্শ নদী গর্ভে স্টিমার কোম্পানীর লোক আসিয়া বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতিয়া যায়, রাত্রে সেই বাঁশের মাথায় লাল আলো মিট্ মিট্ করে, জানাইয়া দেয় এখানে বাঁও মিলিবে। আরো কিছুদিন পরে ভাঁটার

সময় সেখানে মহাজনী নৌকার হাল আটকাইয়া যায়, ইলিশ মাছের ডিঙিগুলি লগি পুঁতিয়া অবসর সময়ে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লয়। তার পর আস্তে আস্তে সেই অথই জল ঠেলিয়া অতিকায় তিমির মতো একটা প্রকাণ্ড চড়া জাগিয়া ওঠে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে চড়ার নোনা ক্ষয় হইতে থাকে, আগাছা জন্মায়, তার পরে আসে মানুষ। অমনি সোনার কাঠির ছোঁয়াচ লাগিয়া যায় যেন। পৃথিবী বিস্তৃত হয়—নতুন মাটিতে নতুন নতুন ফল ও শস্য জন্মিয়া প্রয়োজনের ভাণ্ডারটিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলে।

ইহাই উপনিবেশ। জাতিভেদে নয়, দেশভেদেও নয়। সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত সৌর-জগৎ, মহাকাশ ও মহাকাল ব্যাপিয়া এই উপনিবেশ রচনা হইয়া চলিয়াছে।



১

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা মনে পড়িতেছে।

নবাব আলীবর্দী তখন বাংলার সিংহাসনে। মাকড়সার জালের মতো ধীরে ধীরে ইংরেজের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি বাংলাময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর পলাশীর প্রান্তরে যে ঝড় একদিন করাল মূর্তি নিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, দিকে দিকে তাহারি নিঃশব্দ আয়োজন সুরু হইয়া গিয়াছে।

সেই সময় এবং তার বহু আগে হইতেই নিম্ন বাংলায় পর্তুগীজ জলদস্যুরা অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল। এই 'আর্মাডা' বা হার্মাদদের ভয়ে তখন সমুদ্রের মুখে নদীনালাগুলি এতটুকুও নিরাপদ ছিল না। এই পর্তুগীজের দল কেবল যে বড় বড় জাহাজ লইয়া সমুদ্রে বা নদীতে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত তাহাই নয়, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর চরে তাহারা সুরক্ষিত অনেকগুলি কেল্লা তৈয়ার করিয়াছিল। বড় বড় তোপ পাতিয়া এই সব কেল্লাতে তাহারা শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিত, বোম্বেটে জাহাজে পাল তুলিয়া তাহারা গ্রামের উপর, জমিদার বাড়ির উপর হানা দিত। তাহাদের সেই সমস্ত অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসের বিবর্ণ পৃষ্ঠায় আর ক্ষীয়মান জনস্মৃতির উপরে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে। এই পর্তুগীজদেরই স্মরণ-চিহ্নে চিহ্নিত তেঁতুলিয়ার মোহানায় চর ইস্মাইল।

অতীতকে ভুলিয়া যাওয়ার অশ্রান্ত সাধনার মধ্য দিয়াও চর ইস্মাইল সেদিনের কথা অনেকখানি মনে রাখিয়াছে। লোনা জল

আর নোনা মাটির দেশ—ইঁটের দেওয়াল দুদিনেই জীর্ণ হইয়া আসে, তবুও পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজ অবধিও আত্মরক্ষা করিয়া আছে। চরের দক্ষিণ দিকের যে অংশটা নদীতে ভাঙিয়া নিয়াছে, মাত্র দশ বছর আগে আসিলেও ওখানে তাহাদের প্রকাণ্ড গীর্জার খানিকটা অবশেষ অন্তত দেখিতে পাওয়া যাইত। বালির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া একটা লোহার কামান দেখিয়া তাহাদের বলবিক্রম আজিকার দিনেও খানিকটা অনুমান করিয়া লওয়া চলে।

চর ইস্মাইল।

আজ কিন্তু সেখানে মস্ত বাজার বসিয়া গিয়াছে। সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকঘর, কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্সের ছোটখাট একটি কাছারী। বাসিন্দা যাহারা, তাহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম আর নোয়াখালি হইতে আসা একদল দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু পরিমাণে মগ আর একদল জেলে।

কম করিয়াও এখন প্রায় দেড়হাজার মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করিয়া হাট বসে, আশে পাশের চরে বালাম ধান আর মহিষের বাথান লইয়াই যাহারা দিন গুজরাণ করে, এই একটা দিনে এখানে আসিয়া তাহারা প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অনেক কিছু কেনা-কাটা করিবার সুযোগ পায়। ধানের সময় এখানে আসে বড় বড় মহাজনী নৌকা—আশা করা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের কিছু কিছু প্রসার ঘটিলে হয়তো বা আর্-এস্-এন্ কোম্পানী এই পর্যন্ত স্টিমারের একটা লাইন খুলিলেও খুলিতে পারে।

কিন্তু এত করিয়াও চর ইস্মাইল সভ্য জগতের খুব কাছে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। নদীর নিবিড় ও গভীর মেহ ইহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া আছে। সে মেহের কঠিন বাঁধন ...

ছিনাইয়া নিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাকে আত্মসাৎ করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

নদী—অশান্ত এবং চঞ্চল। জলের আস্বাদ যেমন আঁশ্‌টে, তেমনই নোনা। ভাঁটার সময় আবার সে জলের রঙ নীলাভ হইয়া আসিতে চায়। আর বিচিত্র বর্ণ-গন্ধসমন্বিত সেই জল অন্তহীন বিস্তারে চর ইস্‌মাইলকে সমস্ত জগৎ হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে বলিলেই চলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার সহিত বৎসরে মাত্র ছয় মাস পৃথিবীর সত্যিকারের যোগ-সূত্রটা বজায় থাকে। আশ্বিনের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ—সময় বলিতে ইহাই। যেই নদীর বুকের উপর হইতে কুয়াশার পর্দাটা একটু একটু করিয়া সরিয়া যায় আর চরের গায়ে এখানে ওখানে দু'চারিটি বুনো ফুল ফুটিতে সুরু করে, অমনি পাটির মতো শান্ত নদীটির চেহারা যায় বদ্‌লাইয়া। হয়তো চৈত্রের এক বিকালে আকাশের ঈশান কোণে কে একবিন্দু কালি ছিটাইয়া দেয়—আর তারপরেই গোঁ গোঁ করিয়া চাপা একটা কান্নার মতো শব্দ নদীর তলা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। ক্রমে সেই শব্দটা বাড়িতে থাকে, বাড়িতেই থাকে—সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেরও আগল খুলিয়া যায়। সেই তাণ্ডবে একবার পড়িলে এক গাছের শাল্‌তি নৌকাও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না। আর ঝড় না উঠিলেই বা কী আসে যায়। তেঁতুলিয়া, মেঘনা, ইলসা কিংবা কালাবদরের মুখে যখন তখন যে এক একটা দমকা উঠিয়া আসিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে।

[illegible] বৎসরে ছয় মাস চর ইস্‌মাইল নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া [illegible] বুকের মধ্যে দিন কাটাইয়া চলে। কেবল ডাকের নৌকাই [illegible] যাতায়াত করে, কিন্তু তেমন তেমন প্রকৃতিবিপর্যয় ঘটিলে

তাও যায় বন্ধ হইয়া। সে সময়ে চর ইস্‌মাইল একটা অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো তার সভ্য এবং অর্ধ-সভ্য একদল মানুষ লইয়া নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করিতে থাকে।

এমন একটি সময়ে, সেই সব সভ্য ও অর্ধ-সভ্য মানুষদের লইয়াই এই কাহিনী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্তুগীজেরা আজ আর নাই।

তেঁতুলিয়ার জলে বোম্বেটে জাহাজগুলির ভাঙা দাঁড় আর হালের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কঙ্কালগুলিও লোপ পাইয়াছে। চরের দক্ষিণ দিকে বিলুপ্ত গীর্জাটার সঙ্গেই ছিল তাহাদের গোরস্থান। আজ সেখানে নোনা জলে তির তির করিয়া ছোট ছোট ঘূর্ণি ঘোরে।

তাহারা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের স্মৃতি যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে সে কথাও বলা চলে না। এই চর ইস্‌মাইলে এখনো আট দশ ঘর পর্তুগীজ বাস করে। বাহির হইতে চট করিয়া দেখিলে তাহাদের চেনা কঠিন। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের মুসলমানদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক ঘটিয়া একটা বিচিত্র সঙ্কর জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারা। পরে লুঙ্গি, কানে গুঁজিয়া রাখে গোলাপী বিড়ি, পিতৃপুরুষের ভাষায় শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত চাটিয়া খাইয়াছে বলা চলে। কথায়-কথায় কেবল মেরীর নামে শপথ করে এবং বিবর্ণ একটা ধর্মসিক্ত কালো কায়ের সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখা একটা নিকেলের ক্রস্ তাহাদের ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দেয়।

আর খাড়ভিির মধ্যে যা আছে তাহা হইতেছে তাহাদের নাম।

ইহাদেরই একজন ডি-সুজা সকাল বেলাতেই অত্যন্ত চীৎকার করিতেছিল। বোঝা যাইতেছিল লোকটা চটিয়াছে। বয়সের প্রভাবে

সামনের তিনটা দাঁত ঝরিয়া পড়িয়াছে, কথার মধ্যে আসিয়াছে খানিকটা জড়তা। তাই কী সে বলিতেছিল সেটা ঠিক স্পষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু যে রকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল, তাহা হইতে ইহা বুঝিয়া লওয়া চলে যে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি সে আপ্রাণ-চেষ্টায় গালিবর্ষণ করিতেছে।

গালির চোটে অস্থির হইয়া পাশের বাড়ি হইতে জোহান বাহির হইয়া আসিল।

জোহানের বয়স অল্প। চেহারা দেখিয়া বোঝা যায় লোকটি সৌখীন। চুলটা কাঁধের উপর দিয়া বেশ করিয়া বাবরী করা, পরণে একটি ফর্সা পায়জামা। এই সাত সকালেই সে একমুখ পান লইয়া চিবাইতেছিল।

জোহান বলিল, কী হয়েছে ঠাকুর্দা, এই সকাল বেলাতে অমন ভাবে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

এমন মোলায়েম সম্বোধনেও কিন্তু ঠাকুর্দা খুশি হইল না, বরং আরো ক্ষেপিয়া উঠিল:

—চ্যাঁচাচ্ছি মানে? তুমি যেন এর কিছুই জানো না। ন্যাকা আর কি!

জোহান বিস্মিত হইল না, রাগও করিল না। আবার তাকেই প্রশ্ন করিল, আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? কী হয়েছে ব্যাপারটা তাই খুলে বলো না?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তুমি যে একেবারে গাছ থেকে পড়ছ, বলি আমার বড় রাওয়া মোরগটা গেল কোথায়?

—তোমার বড় মোরগটা? কেন, সেটার আবার কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? দন্তহীন মুখটাকে ডি-সুজা বিকট রকমে ভ্যাংচাইল:

সেটা তোমার পেটে গেছে কিনা সেই খবরটাই তোমার কাছে জানতে চাই।

জোহান বলিল, আমার? আমার পেটে গেছে একথা তোমায় কে বললে?

ডি-সুজা সরোষে কহিল, তবে কার পেটে গেল শুনি? মুরগী তো আর নিজে নিজেই খোঁয়াড়ের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারে না।

এইবার জোহানের চটিবার পালা।

—তাই বলে আমিই চুরি করতে গেলাম! চোরের অভাব আছে দেশে? ত্যাখো ঠাকুর্দা, তুমি বুড়ো মানুষ বলে কিছু বলছি না, নইলে—

ডি সুজা ইহাতে ভয় তো পাইলই না, বরং আরো তিন পা আগাইয়া আসিল। বলিল, নইলে কী করতে, করতে কী সেটা শুনি? তুমি তো পারো কেবল—একটা নিতান্ত অশ্লীল মুখখিস্তি করিয়া সে তাহার বক্তব্যটা শেষ করিল।

গেঞ্জির আস্তিন নাই, তবু অভ্যাস বশে দুই হাতে খানিকটা কাল্পনিক আস্তিন গুটাইয়া জোহান সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল। বলিল, মুখ সামলে কথা কোরো ঠাকুর্দা। ভালো হবে না বলছি।

ডি-সুজা আগুন হইয়া উঠিল। দুঃসাহসী পিতৃপুরুষদের রক্ত তাহার শিরা-উপশিরায় ফেনাইয়া উঠিয়াছে। অথবা জোহানের অপেক্ষা বয়সে খানিকটা বড় বলিয়াই হয়তো পূর্বগামীদিগের সহিত রক্ত সম্পর্কটা তাহার নিকটতর। সেই মুহূর্তে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, রক্ষা করা অপেক্ষা মারামারিটা বেশ করিয়া বাধাইয়া তোলার ইচ্ছাটাই তাহার অধিকতর প্রবল।

ডি-সুজা শাসাইয়া কহিল, তুইও মুখ সামলে কথা বলবি ছোঁড়া। নইলে—

কুরুক্ষেত্র-জাতীয় কিছু একটা হয়তো বাধিয়াই বসিত, কিন্তু বাধিল না। পরিপাটি হইয়া-আসা আয়োজনটির মধ্যে চট করিয়া একটা ছন্দোপতন ঘটিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই ডি-সুজার সামনে কোথা হইতে একটি তরুণী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। সস্নেহে একটি ধমক দিয়া বলিল, কেন পাগ্‌লামি করছ ঠাকুর্দা, তোমার চা হয়েছে, এসো।

ডি-সুজার গলার স্বর চড়া-পর্দা হইতে সেই মুহূর্তেই একেবারে অতি কোমল নিখাদে নামিয়া গেল। বলিল, কিন্তু আমার বড় মোরগটা—

মেয়েটি বলিল, আবার!

ডি-সুজা করুণ স্বরে বলিল, তুই কিছু বুঝিস নে লিসি—

লিসি বলিল, সব বুঝি। তোমার বড় মোরগটা শেয়ালে খেয়েছে, এসো তুমি।

মাথাটি নত করিয়া ডি-সুজা আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

জোহান তখনও তেমনি করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া লিসি শাসনের স্বরে বলিল, ঠাকুর্দা না হয় বুড়ো মানুষ, কিন্তু তোমারও তো একটু মাথা ঠিক রেখে চলা উচিত ছিল।

অত্যন্ত অপ্রতিভাবে কী একটা তো তো করিয়া উত্তর দিবার আগেই লিসি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। এবং খটাং করিয়া জোহানের নাকের সামনেই দরজাটা দিল বন্ধ করিয়া।

জোহান দাঁড়াইয়া রহিল তো দাঁড়াইয়া রহিলই।

খাসমহল কাছারীর নূতন তহশীলদার মণিমোহন পোস্টাপিসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখের ভঙ্গিতে অত্যন্ত প্রকট একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছিল।

কাল রাত্রিতে টানা বৃষ্টি হইয়াছে এক পশলা। সেই বৃষ্টিতে সামনে খানিকটা গর্তের মতো জায়গায় এক হাঁটু জল এবং কাদা জমিয়াছে। মণিমোহন রবারের জুতা জোড়া খুলিয়া হাতে লইল, তারপর কোঁচার কাপড় হাঁটু অবধি তুলিয়া ছপ ছপ করিয়া সেই জল-কাদাটা ডিঙাইয়া সোজা পোস্টাপিসে আসিয়া উঠিল।

পোস্টমাস্টার হরিপদ সাহা তখন একহাতে হুঁকা লইয়া উবু হইয়া বসিয়া চিঠি সর্ট করিতেছিলেন। সকালের ডাক আসিয়াছে। মেজের উপর একরাশ চিঠিপত্র চারিদিকে ছড়ানো—পিয়ন কেরামদ্দি সেগুলি বাছিতেছিল আর পোস্টমাস্টার একটু দূরে বসিয়া রেজেস্ট্রি, বেয়ারিং ও মণি-অর্ডারগুলি আলাদা করিয়া লইতেছিলেন।

মণিমোহন জানালা দিয়া উদ্‌গ্রীব ও উদ্বিগ্ন চোখে চিঠি বাছাই দেখিতে লাগিল। একরাশ লম্বা সরকারী খাম এপাশে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—ওগুলি নিশ্চয়ই খাসমহল আফিসের চিঠি। মণিমোহন ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নামে কোন পার্সনাল চিঠি এসেছে মাষ্টারমশাই?

চোখ তুলিয়া চাহিয়া পোস্টমাস্টার বলিলেন, পার্সনাল চিঠি? আপনার নামে? কই, চোখে তো পড়ল না। একবার ভালো করে দেখে দাও দিকি কেরামদ্দি।

দু'হাতে চিঠির স্তূপগুলি ছড়াইয়া দিয়া কেরামদ্দি বলিল, না বাবু, নেই। যোগেশবাবুর নামে পোস্টকার্ড এসেছে খালি একখানা।

—নেই? মণিমোহন মুহূর্তে বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া গেল। আজ প্রায় সাতদিন ধরিয়া তাহার চিঠি আসিতেছে না। মাঝে একবার সে তিন চার দিনের মতো আদায়ে বাহির হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল আসিয়া অন্তত চিঠিখানা সে পাইবেই। কিন্তু আজও চিঠি আসিল না।

পশ্চিম বঙ্গের ছেলে। ওপারে বর্ধমান মেদিনীপুর, আর এপারে রাণাঘাট—ইহার বাহিরে আর কোনদিন পা বাড়ায় নাই। চলিতে চলিতে দেখিয়াছে রেল লাইনের দু'পাশে মাঠ—ঘন সবুজ শস্যের ঐশ্বর্যে দিক দিগন্তে রঙের সমুদ্রের মতো দুলিয়া উঠিতেছে। উঁচু বাঁধের পাশে পাশে কল্‌মি শাকে ঢাকা টুক্‌রা টুক্‌রা চিক্‌চিকে জল—দু'দিকের প্রসারিত উদার সমতলের বুকে বিস্ময়ের মতো নিঃসঙ্গ বা শ্রেণীবদ্ধ তালের গাছ; আমের বাগানে ঘেরা বাঁশবনের ছায়ায় চাষাদের গ্রাম—পাকুড় প্যাসেঞ্জার, গয়া ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, বা নর্থ বিহার এক্সপ্রেসে বসিয়া সেগুলিকে নিতান্তই কাব্যময় ও স্বপ্নময় বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আরো অনেকের সঙ্গে এক ঝাঁকে বি এস্‌-সি পাশ করিয়া মণিমোহন আদাহুন খাইয়া জীবন সংগ্রামে ভিড়িয়া গেল। অবশ্য বাঙালির জীবন সংগ্রাম বলিতে যা বুঝায় ঠিক তাই। সংগ্রামটা যে কাহার সঙ্গে করিতে হইবে আজ পর্যন্ত সেটা নিশ্চিত করিয়া বলা গেল না। এ সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই—সফলতার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই—বাঁচিয়া থাকার একান্ত শক্তিহীন প্রয়াস: ঠেলাঠেলি ধ্যাকাধ্যি, অবিশ্রান্তভাবে জুতার তলা ক্ষয় করিয়া চলা, স্তূপাকার দরখাস্ত, ফুটপাথের পাশে খড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকা জ্যোতিষীদের দিয়া হাত দেখানো, নবগ্রহ-কবচ এবং কখনো কখনো এক একটা টাকা খরচ করিয়া এক একখানা রেস্রাসে'র টিকেট্‌।

কিন্তু আর কিছু না থাক, অন্তত একটা ব্যবসা এখন পর্যন্ত খোলা আছেই। ব্যবসা না বলিয়া বরং লটারী বলিলে অর্থটা পরিষ্কার হয়। ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী নয় বটে, কিন্তু লোভ, লাভ এবং ল[illegible]না হোক [illegible]কটা সামঞ্জস্য রাখিয়া যায়।

অতএব চাকুরী জুটিবার আগেই মণিমোহন বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্রে আছে, "স্ত্রী ভাগ্যে ধন"—এবং এই সার্থক উক্তিটি প্রমাণ করিবার জন্যই শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের এই সুদূরতম প্রান্তে মণিমোহনের চাকুরী লাভ ঘটিল।

এখানে আসিয়া মণিমোহন এই সত্যটা সকলের আগে অনুভব করিল যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের প্রশস্ত ধানক্ষেতের বাহিরে পৃথিবীর আর একটা রূপ আছে। সে রূপ মানুষকে নিতান্ত মুগ্ধ করে না—দিকে দিকে রাক্ষসীর মতো করালজিহ্বা বিস্তৃত করিয়া সে ফুঁসিয়া ওঠে—গর্জন করিয়া ওঠে। সে মূর্তির দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা আতংকে থর থর করিয়া দুলিতে থাকে।

কিন্তু এই রাক্ষস-মূর্তির যে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত সৌন্দর্য, তাহাকে উপভোগ বা অনুভব করিবার মত দৃষ্টি বা অনুভূতি আজও এই মণিমোহনদের আসে নাই। যেদিন আসিবে, সেদিন হয়তো জীবন-সংগ্রাম কথাটার সমস্ত অর্থটাই যাইবে বদলাইয়া। আগুন-মুখার ষোলো মাইল পাড়ির মুখে আকাশ ঘিরিয়া কালো মৃত্যুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হয়তো সত্যকারের জীবন সংগ্রামের ইঙ্গিতটাকে খুঁজিয়া পাইবে। হয়তো দেখা যাইবে কে আসিয়া বৈশাখী বিপ্লবের সর্বনাশী মুখোসটাকে এক টানে খুলিয়া ফেলিল; তাহার পশ্চাতে এক নবীন রূপ আসিয়া উঁকি মারিতেছে—বজ্রের প্রখর আলোকে তাহার মাথার রত্ন-মুকুট জ্বলিতেছে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া।

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহা কিন্তু আতিথেয়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আসুন না ভেতরে, একটু তামাক খেয়ে যাবেন।

মণিমোহন আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করিল না। ভিতরে ঢুকিয়া সে

কাঠের একখানা টুল টানিয়া লইয়া বসিল ; তারপর পোস্টমাস্টারের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া কহিল, চিঠি কেন এল না বলুন দেখি ?

পোস্টমাস্টার রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, গিন্নীর চিঠি বুঝি ? তা ভয় নেই মশায়, আমরা লুকিয়ে রাখি নি। বয়েস গেছে, বুঝলেন না ?

মণিমোহন হাসিল, না হাসাটা এ ক্ষেত্রে অশোভন। তবুও হাসিটা তাহার তেমন দানা বাঁধিল না।

পোস্টমাস্টার মণিমোহনের মুখভাবটা লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ও গভীর হইয়া উঠিলেন। লোকটি হাঁপানির রোগী। বুকের হাড়গুলি কালো চামড়ার তলায় জিল্ জিল্ করে—সেই কারণে চামড়াটাকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখায়। গলায় কালো সুতার সঙ্গে শাদা একটা কড়ি বাঁধা, ডান হাতে রূপার তারের মধ্যে নানা আকারের একরাশ তাম্রর কবচ।

যতক্ষণ তিনি হাসেন, কালো মুখটা তবু একরকম দেখায়। কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মানুষের ভয় করে। মনে হয়, বহু দিনের কাল-সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়া বর্তমানের ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইয়াছে লোকটা। এই সাগরের উপর দিয়া যে সব ঝড় বহিয়া গেছে—তাহাদের ঝাপ্টা তাহাকে একেবারেই এড়াইয়া যায় নাই। কপালের কুঞ্চিত রেখা-সমষ্টিতে, বুকের জিম্‌জিরে হাড়গুলিতে আর কাঁধের উপরকার প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্নে অনেক ইতিহাস অব্যক্ত হইয়া আছে।

পোস্টমাস্টার বলিলেন, এখন তো তবু দু'তিন দিন অন্তর চিঠি-পত্তর আসে, আর একটা মাস গেলে হয়তো দশ বারো দিন, চাই কি পুরো এক মাসই ডাক বন্ধ থাকবে।

মণিমোহন ভীত হইয়া কহিল, কেন ?

—ডাক আসবে কী করে বলুন ? নদীর অবস্থা তো দেখছেন।

একবার ক্ষেপে উঠলে কারও সাহস আছে না সাধ্য আছে এর ভেতর নৌকো ভাসায়? এক পারে কিছু কিছু মগেরা, কিন্তু ও ব্যাটাদের বিশ্বাস কী বলুন? গলা কেটে মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিলে তো মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই

মণিমোহন হুঁকোটা নামাইয়া বলিল, কিন্তু আমি তো ভাবছিলুম চৈত্র মাসে একবার কিছুদিনের ছুটি নিয়ে—

—দেশে যাবেন, এই তো? কিন্তু সে গুড়ে বালি মশাই, সে গুড়ে বালি। এতো আর আপনার দেশ নয় যে মর্জিমাফিক এক সময় রেলগাড়িতে চেপে বসলেই গড়গড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই, এখানে ভগবানের মর্জির ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হয়। তার উপর মাঝিই পাবেন না বোধ হয়। বেশ কিছু টাকা কব্‌লিয়ে যদি বা একখানা নৌকো জোটাতে পারেন, কিন্তু তাতে চড়ে পাড়ি জমানো আপনাদের মত মানুষের কাজ নয়।

মণিমোহন আরো বিবর্ণ হইয়া কহিল, কেন নৌকো ডুববে নাকি?

—তা কি আর সব সময়ে ডোবে? এ দেশের মাঝিরা অমন কাঁচা নয়। নৌকা ডুববার লক্ষণ দেখলে তারা পাড়িই ধরবে না।

—তা হলে আর ভয়টা কিসের।

—সেই তো বলছিলুম। জাহাজে চেপে সমুদ্দুরে পাড়ি দিয়েছেন কখনো?

—না তো।

—ব্যাপারটা বুঝবেন না তবে। সমুদ্রের রোলিং জানেন তো? বেশি দূর যেতে হবে না,বরিশাল থেকে চাটগাঁর স্টিমারে একটিবার ঘুরে এলেই টের পাবেন। এ হচ্ছে সেই জিনিস—যার অনিবার্য ফল হচ্ছে সী-সিক্‌নেস্ এবং একমাত্র ওষুধ হচ্ছে, লেবুর আরক। কিন্তু নোয়াখালির

মাঝিদের নৌকোয় তো আর চামড়ার কৌচ কিংবা লেবুর আরক পাবেন না।

মণিমোহন বিস্ফারিত চোখে বলিল, নদীতেও কি সে-রকম রোলিং হয় নাকি ?

—হয় না ? আর নদীই বা আপনি কোথায় দেখছেন মশাই ! নদী আর সমুদ্দুরে কি এখানে কি কোন তফাৎ আছে ? জল একবার মুখে দিয়ে দেখবেন, মেসিনের সাহায্যে চেষ্টা করলে এ দিয়ে লবণ তৈরি করা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ আর চর ইস্‌মাইল, আসলে এরা পুরাপুরি এক জাতের—বুঝেছেন ? শ্রাবণ-ভাদ্দরের আগে এ রোলিং আর থামবে না। এসেছেন তো ঠাণ্ডা সময়ে।

—আপনি এই রোলিঙের ভেতর পাড়ি দিয়েছেন কোনোবার ?

পোস্টমাস্টার নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখের উপর দিয়া মেঘের মতো কালো একটা ছায়া যেন বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার কোটরে-বসা চোখ দুইটা যেন অনেকদিনের ঘুমন্ত কপালচ্ছন্নতা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। বহুদিনের মহাকাল-সমুদ্র পার হইয়া গুপ্ত পাথার অভিজ্ঞতা লইয়া যেন মণিমোহনের সামনে অপরিচিতের মত আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

—দিই নি আবার ? বছর পনেরো আগে সে অভিজ্ঞতা একবার আমার হয়েছিল। তারপর থেকেই এইসব সীজ্‌নে নদী পাড়ি দেবার দুঃসাহস আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমিও ঢাকা জেলার ছেলে মশাই, পদ্মা নদীর সঙ্গে সঙ্গেই মিলে মিশে বেড়ে উঠেছি, জলের ভয়টাকে তেমন বিশেষ করিও না। কিন্তু সেবারের সে ব্যাপারে আমারও বুকটা দশ হাত দমে গেছে।

তা হলে ঘটনাটা বলি শুনুন। আমি তখন রণপুরায় ছিলুম।

সে জায়গাটাও ঠিক এই রকম—একেবারে নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশ যাকে বলে। বাড়তির মধ্যে সেখানে একরকম কুকুর পাওয়া যায়—সমস্ত বাংলা দেশে সে কুকুরের জোড়া নেই। পর্তুগীজেরা এনেছিল। নেকড়ে আর বন-কুত্তোর ব্রিডিং, বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর, গ্রেহাউণ্ডের চাইতেও বিশ্বাসী। এরই এক জোড়া কুকুর আমি সেবারে কিনেছিলুম।

চৈত্রের শেষ—বুঝতেই তো পারেন সময়টা কেমন। অর্থাৎ কথায় কথায় যখন কাল-বোশেখী ঘনিয়ে আসে, ঠিক সেই সব দিন। বহুকষ্টে একখানা নৌকা জোগাড় করে দুর্গা বলে এক সকালে ভেসে পড়লুম। সঙ্গে সেই কুকুর জোড়া।

পানসী চলতে লাগল। নদীতে অল্প অল্প বাতাস—প্রথমটা তো ভালোই লাগছিল, ভাবলুম, এমনিই চলবে, "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।"

কিন্তু মশাই, কলির সন্ধ্যে তখনো আসে নি। এল যখন, আমরা ডাঙা ছাড়িয়ে তখন প্রায় মাইল চারেক এসে পড়েছি। নৌকো ঘন ঘন দুলতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, গা বমি বমি করতে লাগল, তারপর চোখ বুজে নৌকোর খোলের ভেতর সোজা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়লুম।

না, ঝড় আসে নি। আকাশের কোন প্রান্তেও দেখা দেয় নি একটুরো কালো কিংবা সোণামুখা মেঘ। কিন্তু অথই অন্তহীন নদীর বুক থেকে হু হু করে বাতাস উঠে এল—একটু মলয়-পবন বলা যেতে পারে। সে বাতাসের তালে ফুলে উঠল অসংখ্য ঢেউ—আর নৌকোটা একবার শাঁ করে ঠেলে আকাশে, আর একবার সোজা পাতালে নেমে যেতে লাগল।

দুদিনের পাড়ি। কিন্তু পুরো দেড়দিন আমার একরকম জ্ঞানই ছিল না বললেই চলে। নৌকো ডুববে কি ডুববে না সে ভাবনা ভাববার সময় ছিল না, কেবল থেকে থেকে অস্পষ্টভাবে এই চেতনাটাই মাথার ভেতর ঘা

মারছিল যে এই দুলুনির চোটেই আমার সোজা স্বর্গলাভ ঘটবে। বড় বড় জাহাজের ওপর চেপেও মানুষ যার ধাক্কায় হিমসিম খেয়ে যায় মশাই, এতটুকু একখানা পান্‌সীর ভেতর তার অবস্থাটা কী রকম দাঁড়ায় না বললেও সেটা টের পাচ্ছেন আশা করি।

সেই বাঘা-কুকুরদের একটাকে তো নদীর মধ্যেই ফেলে দিতে হয়েছিল, আর একটাকে নিযে শেষ পর্যন্ত ডাঙ্গায় এসে যখন পৌছুলুম, তখন তারও জীবনী-শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোনোমতে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলুম, কিন্তু বাঁচল না, দু'তিন দিন পরেই মরে গেল। আর আমি। সে-ধকল সামলাতে পুরো দশটি দিন বিছানাসই হয়ে থাকতে হয়েছিল, বুঝেছেন!

পোস্টমাস্টার কাহিনী শেষ করিলেন।

মণিমোহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া অবস্থাটা কল্পনা করিতে লাগিল। বলিবার ক্ষমতা আছে পোস্টমাস্টারের। চোখ মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলোড়ন পর্যন্ত তাঁহার বর্ণনাটাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে কোন ঘটনাকেই বিশ্বাস করাইয়া দেওয়ার একটা অদ্ভুত প্রতিভা তাঁহার আছে—তাই বহুক্ষণ দৃশ্যটা মণিমোহনের মনের সামনে দিগন্তব্যাপী বিরাট নদীর রোলিংয়ের দৃশ্যটা যেন ছবির মত ভাসিতে লাগিল।

খানিক পরে বড় করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল সে। বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিটা মেলিয়া দিয়া বলিল, কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আদায় করতে। ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরী হবে। এর ভেতর পিয়ন পাঠিয়ে খবর নেব—চিঠি এলে তার হাতে দিয়ে দেবেন।

পোস্টমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা। কিন্তু এবার কোন দিকে বেরোবেন?

—ভাবছি, কালুপাড়ার দিকে নামব। অনেক টাকা বকেয়া পড়ে' রয়েছে—তা ছাড়া—টি-এ বিলটাও বেশ—বুঝলেন না ?

পোস্টমাস্টার মৃদু হাসিলেন। তা আর বুঝি নে মশাই। ওই করেই তো ইংরেজ রাজত্ব চলছে।

আজ্ঞে হাঁ—মণিমোহন হাসিয়া বিদায় লইল।

২

নদীর ধার দিয়াই বেলে-মাটির পথ। পূর্ণিমার জোয়ারে জল তীরের অনেকখানি অবধি ছাপাইয়া গিয়াছিল, তাই পথের উপরে একরাশ এটেল মাটি জমিয়া গিয়াছে। রবারের জুতাটাকে অত্যন্ত চাপিয়া চাপিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। বেশ ছাপ পড়িতেছে কাদায়। চরকা মার্কা জুতা। সস্তা, টেঁকেও অনেকদিন।

এপাশে নদী। বসন্তের ছোঁয়ায় জলের ঘোলাটে বর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে অনেকটা। পরপারহীন অসীম জলের বুকে যতটা চোখ যায় অসংখ্য জেলে-নৌকা ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিয়া উঠিতেছে। এ বৎসর ইলিশ-মাছ পড়িতেছে বেশ। দু'পয়সা করিয়া এক একটা বড় বড় মাছ বিক্রয় হয়। পশ্চিম বঙ্গের ছেলের কাছে ইহা পরম বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

ওই যে—শাদা বড় নৌকাটা আবার আসিয়াছে।

মাসে একবার করিয়া নৌকাখানা এই বন্দরে আসিয়া ভেড়ে। নৌকাখানা বর্মিদের। তাহারা এখানে নাকি ব্যবসা করিতে আসে। কখনো কিছু সুপারী কেনে, কখনো ধান, কখনো বা নারিকেল। আকিয়াবে নাকি তাহাদের কারবার আছে।

দুইজন বর্মি এ পাশে বসিয়া নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করিতেছে, একজন একটা স্টোভ ধরাইতেছে; আর একজন নৌকার ছৈয়ের উপর বসিয়া চোখ বুজিয়া একটা লম্বা চুরুট টানিতেছে। চরের উপর দুইটা মস্ত মস্ত লোহার নোঙর—জোয়ারের জল আসিয়া নৌকাটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা।

বেশ আছে ওরা। বাঁচিতে হয় তো ওদের মতো করিয়াই। সুদূরে বর্মা—মেঘের মতো মাথা তুলিয়া পাহাড়, তাহার কারুকার্য-খচিত গুহাগর্ভে অপূর্ব ভাস্কর্য ; উপত্যকা ভরিয়া নানা রঙের ফুল যেন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। ধূপের ধোঁয়া—ফুলের গন্ধ, রেশমী ঘাগরা পরা চূড়া-বাঁধা মেয়ের দল। প্যাগোডার উদ্ধত শিরে সোনার দীপ্তি ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সমুদ্রের নীল জল পান করিয়া ইরাবতী যেন নীলকণ্ঠ।

সেই দেশ হইতে ওরা আসিয়াছে। পাহাড়, নদী, সমুদ্র ডিঙাইয়া। ঘরের টান এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও ওদের বিচলিত করিয়া তোলে না। আর এই ছয়টি মাস মাত্র সে পশ্চিম বঙ্গ হইতে নিম্নবঙ্গে আসিয়াছে, অথচ ইহারি মধ্যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের ধান-ক্ষেত থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

তা, যে যাই করুক, এখানে সব চাইতে ফলাও ব্যবসা লইয়া বসিয়াছেন কবিরাজ বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন।

ভদ্রলোক বলিলে বাংলাদেশের যে বিশেষ সম্প্রদায়টি বোঝায়, তাহাদের সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। এক আছেন পোস্টমাস্টার—তিনি একাই বেশ আসর জমাইয়া নিতে পারেন। খাসমহলের কর্মচারীদের দু'একজন মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তা ছাড়া সম্প্রতি মণিমোহন আসিয়াছে, কলেকসনের ফাঁকে ফাঁকে টাকা জমা দিতে আসিলে সেও কখনো কখনো এখানকার তাসের আড্ডায় আসিয়া যোগ দেয়।

আতিথেয়তার ব্যাপারে বলরামের তুলনা নাই।

খাটো চেহারার দোহারা গোছের লোকটি, মোটামুটি সুপুরুষ বলা চলে। ঠিক চাঁদির উপরে খানিকটা জায়গা লইয়া চুল পাত্‌লা হইয়া আসিয়াছে, কিছুদিনের মধ্যেই টাক পড়িবে বোধ হয়। মুখখানা

গোলগাল—বেশ খানিকটা পরিতৃপ্ত আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হইয়া আছে। তাসের সঙ্গী কোনো বন্ধু বান্ধবকে দেখিলেই সে পরিতৃপ্তিটা যেন বন্যার মত উচ্ছল হইয়া ওঠে, মাথার অপরিস্ফুট টাকটিও যেন আনন্দে জ্বল জ্বল করিতে থাকে।

ডাকিয়া বলেন, ওরে তামাক দে।

গড়গড়ায় করিয়া তামাক আসে। উগ্র মধুর গন্ধে ভরিয়া যায় ঘরটা। ফর্শীর নলটা আগন্তুকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলরাম ময়লা বালিশটার তলা হইতে এক প্যাকেট তাস বাহির করেন। চটকদার তাস—উপরে অনাবৃতা বিদেশী নারীমূর্ত্তি।

সজোরে তাস জোড়াকে ভাঁজিয়া বলরাম বলেন, আসুন, হয়ে যাক একবাজি। কি খেলবেন, ব্রীজ? ওঃ, আপনি তো আর ব্রীজ জানেন না, তা হলে ব্রে-ই হোক।

তিন বাজি ব্রে হইতে তিনবারই হয়তো তামাক আসিয়া যাইবে।

বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বিশেষ রকম আয়োজন হয়। যেদিন বেশি রাত্রে খেলাটা বেশ করিয়া জমিয়া যায়, সেদিন কবিরাজমশাই মদনানন্দ মোদকের কৌটাটি নামাইয়া আনেন। সে অমৃত এক এক দলা পেটে পড়িলে আর কাহাকেও কিছু দেখিতে হয় না—এই চর ইস্মাইলকেও যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রলোক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কবিরাজের যে হাতযশ আছে সেটা মানিতেই হইবে।

এ হেন মানুষ বলরাম। এই পাণ্ডব-বর্জিত নদীর চরে তিনি একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন। রোগীর জন্য এমন উৎকণ্ঠার কিছু নাই। চরে যথেষ্ট জমি আছে, নোনা জলের পুকুর আছে, সুপারীর বাগান আছে, প্রায় পঞ্চাশটি মহিষ আছে—একরকম ছোটখাটো জমিদার বলিলেই চলে। সুতরাং কবিরাজীটা তাঁহার পেশা নয়—নেশাই বলিতে।

নদীর ধার দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মণিমোহন ভিষক্‌রত্নের আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু অন্যদিনের মতো ভিষক্‌রত্নকে আজ বাহিরের ঘরে পাওয়া গেল না। ভিতর হইতে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বোঝা গেল, কবিরাজ কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

মনিমোহন বিস্ময় বোধ করিল। কবিরাজ যে এখানে নারীসঙ্গহীন নিরাত্মীয় দিন কাটাইতেছে, এই কথাই সকলে জানে। সুদূর ফরিদপুর অঞ্চলে তাহার দেশ—আজ দশ বছর আগে বিপত্নীক হইয়াছে। সুতরাং কোথা হইতে আবার একটি স্ত্রীলোক জোটাইয়া আনিল সে?

ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়া মণিমোহন আশে-পাশে আরো কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিল। ওদিকের বারান্দায় তারের উপর দু'খানা শাড়ী শুকাইতেছে। অন্দর ও বাহিরের ঘরটির মাঝখানকার অবারিত দ্বারটির উপরে পর্দা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে একটা। তামাক-সরবরাহকারী সদাপ্রস্তুত ভৃত্য রাধানাথকেও দেখিতে পাওয়া গেল না—সম্ভবত তাহাকে কোনো কাজে পাঠানো হইয়াছে।

মণিমোহন একটা গলা খাঁকারি দিয়া ডাকিল, মণ্ডলমশাই!

ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলরাম বলিলেন, কে? বসুন, আসছি।

মণিমোহন ফরাসের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেওয়ালের গায়ে একটা ওয়াল-ক্লক অশ্রান্তভাবে টক্ টক্ করিতেছে, পেণ্ডুলামের উপরকার ফাটা-কাঁচের উপর এক খণ্ড কাগজ আঁটা—তাহাতে লেখা: "বুধবার"। অর্থাৎ, বুধবারে দম দিতে হইবে। তিন চারখানা

ক্যালেণ্ডার—তাহাদের দুখানা গত বৎসরের। একখানা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ, কালের ছোঁয়াচ লাগিয়া প্রায় ফেড্ করিয়া আসিয়াছে। দু'খানা বড় বড় চীনা ছবি—কিছুদিন আগে সহর হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে। একখানি যুদ্ধের ছবি—ট্রেঞ্চ্ ফাইটিং হইতেছে, এরোপ্লেন বোমা ফেলিতেছে, ট্যাঙ্কগুলি পাহাড় বাহিয়া উঠিতেছে। আর একখানা একটু আদিরসাশ্রিত—একটি মেয়ে বেশবাস অসম্বৃত করিয়া অশোভন-ভঙ্গিতে বসিয়া।

একটু দেরী করিয়াই কবিরাজ বাহিরে আসিলেন। সাধারণত, তাঁহার আতিথেয়তার পক্ষে ইহা ব্যতিক্রম। বন্ধু-বান্ধব আসিলে এত দেরী করিয়া তিনি কখনো তাহাদের অভ্যর্থনা করেন না।

বাহিরে আসিয়া কবিরাজ একগাল হাসিলেন।

—এই যে আপনি। কবে এলেন?

—কাল।

—বেশ, বেশ, ভালো ছিলেন তো? আজকাল আবার যে-রকম নোনার হিড়িক, প্রায়ই আমাশা-টামাশা হচ্ছে। পথে-ঘাটে ঘুরতে হয়, একটু সাবধান থাকবেন আর কি।

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ। এবার ভাবছি আপনার কাছ থেকে কিছু ওষুধ-পত্তর নিয়ে যাব।

—তা যাবেন। ভাস্কর-লবণ আর কৃষ্ণ-চতুর্মুখ, পেটের অবস্থা পরিষ্কার রাখতে ওর আর জুড়ি নেই—বুঝলেন না?

—বেশ তো, দেবেন ওষুধ দুটো।

কিন্তু ইহার ফাঁকে ফাঁকেই মণিমোহন লক্ষ্য করিতেছিল, কেমন যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ভিষক্‌রত্ন। বন্ধু-বান্ধব আসিলে সাধারণত যে-ভাবে সে খুসি হইয়া উঠিত, আজ যেন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে।

যেন তাহার উপস্থিতিটা বলরামের কাছে তেমন প্রীতিকর ঠেকিতেছে না। আরো বিস্ময়ের সঙ্গে মণিমোহন দেখিল, ইহার মধ্যে বলরাম একবারও তামাক আনিতে আদেশ দিল না, অথবা তাকিয়ার তলা হইতে তাস জোড়া বাহির করিয়া একবারও বলিল না, হবে নাকি এক বাজি ব্রে! আসুন না।

প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করিতে হইল মণিমোহনকেই।

—বাড়িতে কেউ এসেছে নাকি? কোনো আত্মীয়?

বলরাম খানিকটা হাসিলেন—তবে হাসিটা যেন একটু অপ্রতিভ ঠেকিল। বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—অনেকটা তাই বই কি। হাত পুড়িয়ে আর রেঁধে খাওয়া যায় না, তাই গ্রামের একটি পরিচিত মেয়েকে নিয়ে এসেছি কিছুদিনের জন্যে—অন্তত দেখাশোনাটা তো করতে পারবে।

কোথা হইতে এক বোঝা পুঁই শাক আনিয়া রাধানাথ ঝুপ করিয়া ভিষক্‌রত্নের সম্মুখে ফেলিল। ঘোষণা করিল, চিংড়ি মাছ পাওয়া গেল না বাবু।

—পাওয়া গেল না? কেন পাওয়া গেল না শুনি? সকাল থেকে বারবার ক'রে বলছি, বাবুর আর বেরোতে সময়ই হয় না। চিংড়ি মাছ পাস নি তো ও জঙ্গলগুলো এনে হাজির করেছিস কী জন্য? দূর ক'রে টেনে ফেলে দে সব।

রাধানাথ কহিল, না পাওয়া গেলে কী করব বাবু? জেলেরাই পায় না, জল থেকে মাছগুলো কি আমার হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আসবে নাকি?

—যা যাঁ হয়েছে, আর তকরার করিস নি। এগুলো ভেতরে নিয়ে যা। এতটুকু উপকার নেই, তর্কের বেলায় চওড়া চওড়া কথা।

রাধানাথ বিড় বিড় করিতে করিতে শাকের বোঝাটা তুলিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া বলরাম বলিলেন, দেখেছেন তো ব্যাপারটা! মেয়েটা ভালোবাসে পুঁই চিংড়ি, কাল থেকে বলছি—তা আজ এসে বলছে মাছ পাওয়া গেল না। দূর ক'রে দেব হতভাগা অকর্মাকে।

মণিমোহন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বলিল, আচ্ছা, এখন উঠি কবিরাজমশাই।

কবিরাজ অসংকোচেই কহিলেন, আসুন মাঝে মাঝে দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেবেন আর কি। তা ছাড়া কৃষ্ণ-চতুর্মুখ আর ভাস্কর-লবণ—

—বিকেলে নিয়ে যাব'খন, বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

চলিতে চলিতে মণিমোহনের মনে বলরামের পরিবর্তনের কথাটা বিশেষ করিয়া বাজিতে লাগিল। এতদিন এই চরের নির্বাসনে বসিয়া যে নিঃসঙ্গ নিরাত্মীয় জীবন কবিরাজকে যাপন করিতে হইয়াছে, সে জীবনটাকে সে সামাজিকতা দিয়াই পূর্ণ করিয়া নিতে চাহিয়াছিল। তাই তাম্রকূট বিতরণে তাহার কৃপণতা ছিল না, সুযোগ এবং সময় পাইলেই এক জোড়া তাস ভাঁজিয়া লইয়া খেলিতে বসিতে তাহার বাধে নাই। বাহিরের জগৎটাকেই সংসারে পরিবর্তিত করিয়া বেশ সুখী এবং পরিতৃপ্ত হইয়া ছিল সে।

কিন্তু সামাজিকতারও একটা সীমা আছে মানুষের। প্রয়োজনের বাহিরে নিজেকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতে হয় তাহাকে। সেই মুহূর্তে নিজের বহুল প্রসারিত সত্তাটাকে তাহার সংকুচিত করিয়া আনিতে হয়, একটি কেন্দ্র-বিন্দুর চারিদিকে নিজেকে ঘন করিয়া সে আবদ্ধ রাখিতে চায়। বহুদিনের

অতিরিক্ত আত্ম-প্রসারের ক্লান্তি তাই আজ নবাগতার সীমানাতে আসিয়াই বিশ্রাম খুঁজিতেছে। সেই কারণে মেয়েটির প্রতি তাঁর মনোযোগ যে একটু বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্ময়বোধ করিবার কিছু নাই।

আজ স্ত্রীর কথা খুব বেশি করিয়া তাহার মনে পড়িতেছে। ছয়মাস হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া আছে—একবারও এমন একটু ছুটি পাইল না যে বাড়ি হইতে ঘুরিয়া আসে। তা ছাড়া একটু আগেই হরিদাসের কাছে যা শুনিয়াছে, তাহাতে আরো কিছু-দিনের মধ্যেও যাওয়াটা ঘটিয়া উঠিবে কিনা অনুমান করা কঠিন।

চিঠি আসিতেছে না। বাড়িতে কী হইয়াছে কে জানে। এই দূর বিদেশে বসিয়া মনে উৎকণ্ঠা পোষণ করা ছাড়া কিছুই আর করিবার নাই। কয়েকটা টাকার জন্য এভাবে আত্মপীড়ন করার কোনো অর্থ হয় না। আর একটা মাস দেখিয়া না হয় চাকরীই ছাড়িয়া দিবে সে। বি এস্-সি তো পাশ করিয়াছে—কিছু না কিছু একটা জুটিয়া যাইবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই যে—সামনেই কাছারী। খাওয়া দাওয়া সারিয়া দুপুরের মধ্যে কাগজপত্র সব ঠিক করিয়া নিতে হইবে—না হইলে বিকালে রওনা হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। বসিয়া দুটি দিন বিশ্রাম করারও জো নাই—এ মাসের মধ্যে তাহাকে দশহাজার টাকার কলেক্শন দেখাইতে হইবেই।

মুরগী-চুরির ব্যাপারটা ডি-সুজা এত সহজেই ভুলিতে পারিতেছিলনা। খাসা বড় মুরগীটা—অন্তত আড়াই সের মাংস যে হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নধর পরিপূর্ণ শরীরে লালকালো পালক-গুলি রোদ লাগিয়া যেন চিক চিক করিয়া দীপ্তি পাইত—দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়া যাইত ডি-সুজা। ধবধবে শাদা যে বড় মুরগীটা অন্যান্য মোরগদের একান্ত লোভের বস্তু ছিল, বিপুল বাহুবলে সেই সর্বজন-প্রিয়াকে সে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল। নারী বীরভোগ্যা, তাহার গর্বিত আচরণে এ সত্যটা সব সময়ে প্রকাশ পাইত।

রুখিয়া যখন দাঁড়াইত—তখন একটা দেখিবার মতো বস্তু হইত সেটা। ময়ুর-কণ্ঠী রঙের দীর্ঘ লেজের গুচ্ছটি বিস্তৃত হইয়া জাপানী পাখার মতো ছড়াইয়া পড়িত—গলার পালকগুলি ফুলিয়া উঠিয়া বুকের সঙ্গে মিশিয়া যাইত, মাথার চূড়ার লাল রঙ যেন আগুনের মতো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সকাল বেলায় যখন বাড়ির প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করিত, তখন কাহার সাধ্য ঘুমাইয়া থাকিবে! সে-তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকারে বাড়ি শুদ্ধ সবাই তো জাগিয়া উঠিতই—দু'মাইল দূর পর্যন্ত সে শব্দ ভাসিয়া যাইত।

ডি-সুজা সুতরাং আক্ষেপ করিতেছিল।

লিসি বলিল, তোমার হ'ল কি ঠাকুর্দা? একটা মুরগীর শোকে কি আজ সারাদিন মুখ থুবড়ো ক'রে ব'সে থাকবে?

—একটা—একটা মুরগী! একে তুই এই ব'লে উড়িয়ে দিতে চাস? এ রকম একটা মুরগী যে দশটার সমান। ক'জনের এমন মুরগী আছে খোঁজ ক'রে ছাখ্ দিকি। তা ছাড়া ক'দিন বাদে গঞ্জালেস্ আসবে, ভেবেছিলুম, তখন ওটাকে কাজে লাগাব, তা আর—

রোষে অভিমানে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল ডি-সুজার।

লিসি কহিল, তাই বলে তুমি জোহানের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে কেন?

জ্বলিয়া উঠিল ডি-সুজা।

—জোহান! ওকে তুই বুঝি নিরীহ ভালো মানুষটি ভেবেছিস, তাই

না? আমি ক'দিন থেকেই দেখেছি মুরগীটার দিকে ও প্রায়ই আড়চোখে তাকায়। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

লিসি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ও মুরগীটার দিকে যে একবার তাকাত, তার ওপরেই তো তোমার সন্দেহ হ'ত ঠাকুর্দা। তার চেয়ে এ বরং ভালোই হয়েছে—এখন অন্তত রাত্রিতে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

ডি-সুজা বলিল, হয়েছে, থাম্ থাম্। আজকাল দেখছি, জোহান ছোঁড়াটার ওপর তোর মন ফিরেছে। খবর্দার বলছি, ও'কে কক্ষনো আমার বাড়িতে ঢুকতে দিবি নে। ঢুকলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব—এই বলে রাখলুম।

মুহূর্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল লিসির মুখ। পর্তুগীজের মেয়ে—কিন্তু ভিতরে খানিকটা মগের রক্ত আছে বলিয়াই নাকটা একটু খর্বাকার এবং ভ্রূরেখা অপেক্ষাকৃত বিরল। সবটা মিলিয়া কেমন একটা অপরিচিত বৈশিষ্ট্য আছে সে মুখে। তাই সে রাগ করিলে কেন যেন ডি-সুজার মতো অসংযমী মানুষও ভয় পাইয়া যায়।

লিসি বড় বড় পা ফেলিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল এবং ডি-সুজা খানিকক্ষণ রহিল একেবারে গুম্ হইয়া বসিয়া। বাস্তবিক, এ সত্যটা তাহার কাছে আর চাপা নাই যে লিসির আকর্ষণটা জোহানের দিকে ক্রমশই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। সময় অসময়ে জোহান এ বাড়িতে আসিয়া জাঁকাইয়া বসে, পান চিবায় এবং আরো কতটা যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ডি-সুজা অনুমান করিতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে বাহির হইতে সে যখন বাড়িতে আসে, হয়তো দেখে জোহান লিসির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া অত্যন্ত বেশি পরিমাণে হাসিতেছে; দেখিয়া ডি-সুজার মনের শেষ প্রান্তটা অবধি জ্বলিয়া যায় যেন। তবু

কিছু বলিবার জো নাই। জোহান ছোটবেলা হইতেই এ বাড়িতে আসে যায়, লিসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। তা ছাড়া লিসির চ্যাপ্টা নাক এবং বিরল ভ্রূর উপর দিয়া যখন ক্রোধের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে, তখন ডি-সুজা কেন যেন অত্যন্ত অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত বোধ করিতে থাকে।

তবু নিতান্ত মনের জ্বালাতেই সে লিসির মুখের উপর এতবড় কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। একেই তো মুরগীটা খোয়া যাইবার ফলে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর জোহানের প্রতি লিসির এই পক্ষপাতের মতো অসহ্য ব্যাপার আর কিছু নাই। পাত্র হিসাবে জোহান নিতান্ত অযোগ্য নয়, কিন্তু দিনের পর দিন যে সে অধিকার বিস্তার করিয়া ডি-সুজার মন হইতে লিসিকে ছিনাইয়া লইতেছে এ অপরাধ ক্ষমা করিবার নয়। বিশেষ করিয়া মুরগী চুরীর সন্দেহটা সেই জন্যই জোহানের উপর তাহার বেশ করিয়া পড়িয়াছে।

বাইরের দরজায় কয়েকটা ঘা পড়িল।

ডি-সুজা বলিল, কে?

দরজার পথে একজন বর্মি মূর্তি দেখা দিল। ইহাদের বড় নৌকাটাই আজ সকালে আসিয়া ভিড়িয়াছে। ডি-সুজা সুপারীর কারবার করে, তাই সুপারীর সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাইবার জন্যই সে এখানে আসিয়াছে বোধ হয়।

চকিত হইয়া ডি-সুজা বলিল, তোমরা কখন এলে?

বর্মিটি হাসিল। পালিশ করা তামার উপর চিত্রকরা মুখ, সে মুখে এতটুকু ভাবের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায় না। মনের অসংখ্য ওঠা-পড়া তাহার বাহিরের অবয়বে আসিয়া যেন একটি রেখাও আঁকিয়া দিতে

পারে নাই। পাথরের একটা প্রতিমূর্তির উপর যেন একটুকরা যান্ত্রিক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সে বলিল, কাল সকালে।

ডি-সুজা চারদিকে একবার তাকাইল। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়া বাহিরের কবাটাটায় শক্ত করিয়া খিল আঁটিয়া দিয়া বলিল, ভিতরে এসো।

দুইজনে ঘরে ঢুকিল। অত্যন্ত সাবধানে ডি-সুজা ঘরের সমস্ত দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল, আধা-অন্ধকারে ভরিয়া গেল ঘরটা। শুধু এককোণে স্তূপাকার রাশীকৃত রসুন হইতে উগ্র খানিকটা গন্ধ উঠিয়া নিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেরোসিনের একটা ছোট ডিবা আনিয়া জ্বালিল ডি-সুজা। ঘরময় একটা বিচিত্র নীলাভ আলো ছড়াইয়া পড়িল—এবং তাহার আভাতে বর্মির ঘষা তামায় তৈরী মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকম নৃশংস দেখাইতে লাগিল।

গলা নীচু করিয়া ডি-সুজা কহিল, তারপর কী খবর?

বর্মিটি পেটের দিকে হাত চালাইয়া রেশমি লুঙ্গির মধ্য হইতে ভাঁজ করা একখানা চিঠি বাহির করিয়া ডি-সুজার হাতে দিল।

চিঠিটা পড়িয়া ডি-সুজা সেটাকে ডিবার শিখার মুখে ধরিল। দেখিতে দেখিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল সেখানা। ছাইগুলিকে জুতা দিয়া বেশ করিয়া মাড়াইয়া ডি-সুজা কহিল, দশ সের?

বর্মিটি বলিল, হাঁ।

ফুঁ দিয়া বাতিটা নিভাইয়া দিয়া ডি-সুজা বলিল, এবার আশে পাশের অবস্থা গরম। একটু সাবধান হয়ে চালাতে হবে। শুনেছি, গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে।

বর্মিটি হাসিল। আধা অন্ধকারে সে অনুভূতি-বর্জিত মুখখানা দেখা গেল না—কেবল সামনের সোণা বাঁধানো দাঁতটা যেন একবার ঝিলিক দিয়া গেল।

বলিল, হুঁ, সে ভয় খুব আছে। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে যে পুলিশ আসবে, এ প্রায় ধরে নেওয়া যায়। তবে আর দু'মাস মাত্র সময় —এর ভেতরে যদি না আসে তো সাত আট মাসের মধ্যে এ তল্লাটে আর ভিড়বে না।

ডি-সুজা কিন্তু বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

—কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পুলিশ আসবে? তা হলে তো এখন থেকেই হুঁসিয়ার থাকতে হয়।

—তা বই কি। সেই জন্তেই এটা রেখে দাও। দরকার মতো কাজে লাগাতে হবে। অন্ধকারের মধ্যেই এবার সে যাহা বাহির করিয়া আনিল, অস্পষ্টভাবে সেটাকে দেখিয়াই ডি-সুজা চমকিয়া উঠিল। হিমশীতল তাহার স্পর্শ—অন্ধকারে সাদা ছোট নলটি চিক চিক করিতেছিল।

—হাঁ ভরাই আছে। একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো, ছটা ঘরের একটাও খরচ হয় নি। ধরা যদি পড়তেই হয়, তা হলে খালি খালি ধরা দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। দু'একজনকে মেরে —তবে তো।

তাহার নীরব হাসিটা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিল। সংক্ষিপ্ত চাপা হাসি—কিন্তু মুখের কথার মতোই তাহা নিষ্ঠুর এবং অর্থপূর্ণ।

বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল ডি-সুজার। তবু হাত বাড়াইয়া সে অস্ত্রটা লইল, বলিল, আচ্ছা তাই হবে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তা হলে আমি চলি।

তখন সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে। বাহিরে উঠানের উপরে একরাশ সুপারী ও নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়াছে—স্বাভাবিকের অপেক্ষা আরো এক পোচ গভীর অন্ধকার। দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্র মনে হইল দরজার দিক হইতে কেউ যেন চট্ করিয়া সরিয়া গেল।

দুইজনেই দাঁড়াইল থম্‌কিয়া। নক্ষত্রবেগে দক্ষিণ হাতটাকে কোমরের কাছে লইয়া গিয়া বর্মিটি কঠিনস্বরে বলিল, কে গেল?

দ্রুত গতিতে সাম্‌নে আগাইয়া গেল ডি-সুজা। সদর দরজাটা হাট করিয়া খোলা, বাহিরে হালকা অন্ধকারের বিস্তৃতি। তাহার মধ্যে কাহারও আভাস পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরের মধ্য হইতে মাংস ভাজার গন্ধ আসিতেছে।

ডি-সুজা ডাকিল, লিসি!

একটা ঝাঁজরী হাতে করিয়া লিসি বাহির হইয়া আসিল, বলিল, ডাকছ?

—বাড়িতে কেউ এসেছিল?

—না তো।

—সদর দরজাটা কে খুলে রেখেছে?

লিসি অবিকৃত স্বরে বলিল, আমি। কেন কী হয়েছে? তাহার জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি বারান্দার লণ্ঠনটার অপরিচ্ছন্ন আলোয় নবাগতের মুখের উপর ঘুরিতেছিল।

ডি-সুজা চাপা গলায় বলিল, না, কিছু হয় নি।

বর্মিটির পাথরের মতো ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ দৃষ্টিটা একবারের জন্য লিসির সঙ্গে মিলিল মাত্র। মনের অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে একটা ভয়ের আকস্মিক চমক উঠিয়া লিসির সর্বাঙ্গে যেন শির্ শির্ করিয়া ছড়াইয়া

গেল। মনে হইল, মুহূর্তের দৃষ্টিটাকেই একটা সন্ধানী আলোর মতো ফেলিয়া এই লোকটা তাহার ভিতরের অনেকখানিই দেখিয়া লইয়াছে।

বাহির হইয়া যাওয়ার সময় সে আর একবার ডি-সুজার কানের কাছে বলিয়া গেল, সাবধান থেকো, খুব সাবধান।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারের কুঁদাটা পাথরের মতো ভারী আর শীতল হইয়া উঠিতেছে। তাহার কপালে জমিয়াছে দুইটা বড় বড় ঘামের বিন্দু।

৩

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহাকেও এখানে সঙ্গীহীন জীবন কাটাইতে হয়।

তাই বলিয়া তিনি বিপত্নীক নন। রণচণ্ডী একটি স্ত্রী আছেন, আর আছে কাকের মত কালো, বকের মত শীর্ণ একপাল ছেলেমেয়ে। পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহারা যে চতুর্দশ পুরুষকে নরকস্থ করিতেই জন্মিয়াছে, ইহাতে পোস্টমাস্টারের কোন সন্দেহ নাই। ঢাকা সহরে মামারবাড়িতে তাহারা আছে এবং সম্ভবত কুশলেই আছে বলিয়া হরিদাস অনুমান করেন। রাগের মাথায় কুরূপা স্ত্রীর গায়ে একদিন হাত তুলিয়াছিলেন বলিয়া ছেলেপিলে লইয়া স্ত্রী জন্মের মত বাপের বাড়ি গিয়া উঠিয়াছেন। শ্বশুর ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি, ঢাকায় আর নারায়ণগঞ্জে তাঁহার মস্ত কারবার। তিনি নাকি গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন, হরিদাস তাঁহার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসিলেও তিনি তাঁহার হাড় মাংস একত্র রাখিবে না।

শুনিয়া হরিদাস খুশি হইয়াছিলেন। রাজসাহীতে থাকিবার সময়ে শনিগ্রহরূপী শয়তান পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেটের মৃত্যু সংবাদেও তিনি এতটা খুশি হইয়া ওঠেন নাই। শ্বশুরবাড়ির ত্রিসীমানার কাছে আগানো তো দূরের কথা, তাহার তাঁহারা ছায়া না মাড়াইলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সখের খাতিরে একদা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সখের সেই নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়া হরিদাস সাহা বহুকাল পরে ভগবানকে একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন।

তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বিশ্বাস না থাকুক আরোগ্যের আশ্বাসে হাতে গলায় একরাশ মাদুলি ঝুলাইয়াছেন হরিদাস। কিন্তু চর ইস্মাইলের

এই অনাত্মীয় প্রয়াস-জীবনে কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় যখন সমস্ত মাদুলি আর তাবিজের অনুশাসনকে অস্বীকার করিয়া হাঁপানীর টান উঠিয়া আসে তখন হয়তো মাঝে মাঝে কুরূপা তীক্ষ্ণকণ্ঠী স্ত্রীর স্মৃতি সমস্ত বিতৃষ্ণার স্তূপ ভেদ করিয়া ঠেলিয়া ওঠে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া যখন মুমূর্ষু কাত্‌লা মাছের মতো হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বাতাসের যোগাযোগ রাখিতে হয়, যখন রহিয়া রহিয়া কেবল এই কথাটাই মনে পড়ে যে মৃত্যুর রূপটা ইহার চাইতে অনেক বাঞ্ছনায়, তখন চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভাসিয়া ওঠে স্ত্রীর মুখখানা। এখন কেউ একবার বুকের উপরে একখানা কোমল হাত বুলাইয়া দিলে যন্ত্রণার অনেকখানি লাঘব হইত হয়তো।

এপাশ ওপাশ করিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকেন, কেরামদ্দি ?

পিয়ন কেরামদ্দি এ সময়টায় প্রায়ই তাঁহার পাশে আসিয়া বসে। পোস্টাপিসেরই এক পাশে সে-ও থাকে। এখানে তাহার বাড়ি নয়—বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছে। দুইজনেই বৈদেশিক বলিয়া পোস্টমাস্টারের প্রতি কেমন একটা স্নেহ ও সহানুভূতি আছে কেরামদ্দির।

জবাব দেয়, কী বলছেন ?

—এ কষ্ট আর তো সয় না। বাড়ির ওদের আনাতেই হয়—না ?

কেরামদ্দি তাঁহাকে চিনিয়াছে। তাই মনে মনে এতটুকুও উৎসাহিত বোধ করে না। কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়া বলে, আজ্ঞে আনাই তো উচিত।

—শ্বশুরমশাই, গুরুজন। দুটো মন্দ যদি বলেই থাকেন, সেটা ঘাড় পেতে নেওয়াই সঙ্গত। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে লজ্জার কিছু নেই।

—আজ্ঞে তা তো নেই-ই।

পোস্টমাস্টার শ্বাস টানিতে টানিতে বলেন, তা হলে কালই একখান

দরখাস্ত দিয়ে দেব, কেমন? এক মাসের ছুটি—হ্যাঁ, এর কমে দেশে গিয়ে ওদের আর নিয়ে আসা যায় না।

—আজ্ঞে, তা যাঁয় না।

হরিদাসের কণ্ঠস্বর এবারে সন্দিগ্ধ ও বেদনার্ত হইয়া ওঠে।

—কিন্তু যদি ছুটি না দেয়?

কেরামদ্দি আশ্বাস দিয়া বলে, আজ্ঞে তা দেবে না কেন?

উত্তেজিত হইয়া ওঠেন হরিদাস। বুকের উপর হাত চাপিয়া তিনি প্রায় উঠিয়া বসেন: না-ও দিতে পারে—বিশ্বাস নেই ব্যাটাদের। মানুষ মরুক কিংবা বাঁচুক, তাতে ওদের কোনো নজর আছে নাকি? যেমন ক'রে পারে খাটিয়ে নিলেই যেন হ'ল।

উত্তেজনা বাড়িতে থাকে হরিদাসের। চোখ দুইটা বড় বড় হইয়া ওঠে—গলার আওয়াজটা পুরোপুরি বসিয়া যায়। শ্বাসের টানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাস্ ফ্যাস্ করিয়া বলিতে থাকেন, না দেয় ছুটি না দিলে! রিজাইন্ দেব এমন চাকরিতে। ঘরে কি খাওয়ার ভাবনা আছে যে জান প্রাণ দিয়ে এখানে পড়ে থাকব? ছুটি না পেলে আমি চাকরীতে রিজাইন্ দেব—নিশ্চয় দেব, এ আমি তোমাকে ব'লে রাখলাম।

কেরামদ্দি ব্যস্ত হইয়া ওঠে। একপাশে টি-পয়ের উপর হইতে মালিশের ওষুধটা লইয়া সে হরিদাসের বুকে ডলিতে থাকে। শান্তস্বরে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না বাবু। যা দরকার তা করা যাবে কাল সকালে।

কিন্তু পরের দিন সকালে উঠিয়া এ সব কথা আর হরিদাসের স্মরণ থাকে না।

বিস্মৃতিই বলিতে হইবে একরকম। হাঁপানির অসহ্য কষ্টের সময় মুখ দিয়া অবচেতনার যে কথাগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেগুলিকে

অসুস্থতার প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দিনের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত রকমের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আসিয়া যেন অভিভূত করিয়া ফেলে হরিদাসকে। নিশীথের গৃহপ্রবণ পীড়াতুর মনটি দিবালোকের সংস্রবে আসিয়া বিদ্রোহী এবং যাযাবর হইয়া ওঠে। হরিদাসকে তখন সিনিক্ বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

কেরামদ্দি মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দেয়।

—ছুটির দরখাস্ত করবেন নাকি বাবু?

সশব্দে হাসিয়া ওঠেন হরিদাস। হাসিতে কৌতুক এবং শ্লেষ মিশানো।

—ছুটি! ছুটি কিসের জন্যে? তুমি কি ভাবছ, ওই কাল্-প্যাঁচাদের ভাবনায় রাত্তিরে আমার ঘুম হচ্ছে না? বাপ—যে ক'রে ওগুলোর হাত এড়িয়েছি, আমিই জানি।

—ছেলেপিলের মুখ একবারও দেখতে ইচ্ছে করে না বাবু?

আর একবার সশব্দ উচ্চ হাসিতে প্রশ্নটাকে উড়াইয়া দেন হরিদাস। মুখের সামনে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া তিনি চোখ বুঁজিয়া কিছুক্ষণ ধূমপান করেন। তারপর বলেন, কখনো পাহাড় অঞ্চলে বেড়িয়েছ কেরামদ্দি?

—আজ্ঞে না।

—আমি বেড়িয়েছি। সুসঙ্গের পাহাড়ে—যেখানে হাতী ধরে। সে কী জঙ্গল আর কী দুর্গম! একটুর জন্যে বাঘের মুখে পড়ি নি সেবারে।

হুঁকা হইতে কল্কেটা নামাইয়া লয় কেরামদ্দি। পোস্টমাস্টারের চোখ-মুখ ধারালো হইয়া ওঠে। কালো মুখের উপর দিয়া একটা ইঙ্গিতপূর্ণ গাম্ভীর্য ঘনাইয়া আসে—সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া একটা প্রত্যাসন্ন গল্পের সংকেত। লোকটা সর্বাঙ্গ দিয়া গল্প বলিতে জানে।

—দু'দিকে দশ বারো হাত উঁচু পাহাড়, মাঝখান দিয়ে হাত তিন চারেক চওড়া একটুখানি জংলা পথ। পাহাড়ে শ্যাওলা আর নানারকম আগাছায় বুক সমান জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ নাকে এল বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ—একবার যে শুঁকেছে, সেই টের পায়। থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারপর তাকিয়ে দেখি—

কেরামদ্দি কল্‌কেটা নামাইয়া রাখে। সাগ্রহ কৌতূহলে বলে, তারপর ?

* * * *

এমনি করিয়া দিন যায় হরিদাসের। স্তূপাকার অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন—ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই সুযোগ ও সুবিধামতো তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কত নতুন প্রকৃতির মানুষ, কত বিচিত্র রকমের রীতি নীতি। নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, ছোট বড়ো অসংখ্য বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার।

এই নিজস্ব দর্শন-রীতিটি ; ইহা হরিদাসকে জগৎ সম্বন্ধে একরকম অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে বলিলেই চলে।

বলরাম ভিষক্‌রত্নের তাসের আড্ডায় বসিয়া মাঝে মাঝে হয়তো বলেন, নাঃ মশাই, কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়।

শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করে, কিসের কথা বলছেন ?

—এই তাসটাস সব। একদিন সব কিছুই হাওয়ায় উড়ে যাবে মশাই—একেবারে ফাঁকা। ওই যে শাস্ত্রে বলছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যে —ওইটেই একমাত্র খাঁটি কথা।

মদনানন্দ মোদকের আমেজে বলরাম ভিষক্‌রত্ন অতিরিক্ত প্রফুল্ল হইয়া ওঠেন।

—বলি মাস্টারের যে অতিরিক্ত বৈরাগ্য দেখছি। একেবারে সাক্ষাৎ হরিদাস স্বামী—অ্যাঁ!

কঠিনমুখে হরিদাস বলেন, বৈরাগ্য নয়। নর্থ বিহার ভূমিকম্পের সময় আমি জামালপুরে ছিলুম তো। সব অবস্থাটাই নিজের চোখে দেখেছি দাদা। বেশ গড়ে উঠেছিল—হঠাৎ একটা যেন হাতুড়ির ঘা খেয়ে ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে পড়ল। তাই মনে হয়, সমস্ত দুনিয়াটাই একদিন এরকম হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে—ধরে রাখবার এত যে চেষ্টা এদের কোনোটাতেই কিছু হবার নয়।

মদনানন্দ মোদকের নেশার দুইটা দিকই আছে সম্ভবত। বলরাম হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া যান। বলেন, যা বলেছ ভাই। ভগবানের মার দুনিয়ার বার—ও ঠেকাবার জো নেই।

হরিদাস যেন বিরক্ত বোধ করেন।

—দৌলতখাঁয় যেবার বান হয়েছিল, জানো সে কথা?

—জানি নে আবার! ওদিকটাকে ত একরকম মুছে নিয়েছিল বললেই চলে। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই সে বানে মারা যায়—ওঃ, সে কী কাণ্ড!

—মনে করো, আবার যদি তেমন কিছু একটা হয়!

বলরাম সভয়ে বলেন, বাপ রে!

হরিদাস হাসিয়া বলেন, মন্দ হয় না তা হলে। যদি বেঁচে থাকি তা হলে বেশ নতুন রকমের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে, কী বলো বলরাম?

—সর্বনাশ! অমন অভিজ্ঞতা দিয়ে দরকার নেই—বেশ সুখেই আছি মশাই। চরের জমিভরা ধান, সুপুরীর খন্দ—এমন সময় অমন

কু-ডাক ডাকতে আছে! তার ওপর আসছে চৈত্র মাস—ও সব কথা ব'লে ভয়ে পাইয়ে দিয়ো না দাদা।

হরিদাসের মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই থাকে।

—ভয় পাও কেন অমন? স্ত্রী পুত্র তো কেউ নেই তোমার। একদিন যখন মরতেই হবে, একটা কিছু বিরাট্ ব্যাপারের মাঝখানে ঘটা করে মরাই ভালো নয়? মনে করো, এখানে লাগল এসিয়াটিক কলেরার মড়ক, আরও দশজনের সঙ্গে তুমিও শেষ হয়ে গেলে, তখন কে ভোগ করবে তোমার এই ক্ষেতভরা ধান আর গোলাভরা সুপুরী!

—হয়েছে, হয়েছে, থামো—রীতিমতো আতংকিত হইয়া ওঠেন বলরাম: এই সাত সকালে কী সব আরম্ভ ক'রে দিলে? এসো, এসো, এক বাজি ব্রে হয়ে যাক্—

তাসজোড়া ময়লা তাকিয়ার তলা হইতে বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু পৃথিবীটা এমন জায়গা যে সম্পর্ক না থাকিলেও এখানে নতুন করিয়া গড়িয়া নিতে কষ্ট হয় না।

অন্তত বলরামের হইল না। একা দিনগুলি কাটিতেছিল। রাধানাথ যা হোক করিয়া রাঁধিয়া নামাইত, রান্নার স্বাদগন্ধ যাই থাক দুধ ঘী এবং মাছের প্রাচুর্যে সেটা এমন মর্মান্তিক বোধ হইত না। কিন্তু "ভূমৈব সুখম্"—অতএব কোথা হইতে একটি মেয়ে আসিয়া জুটিয়া গেল।

দেখা গেল, বলরামের পৃথিবীটা হঠাৎ বিচিত্র রকমে বদলাইয়া গেছে। তাসের পাটটা তুলিয়া দিতে পারিলেই বলরাম যেন শান্তি পান একরকম। তবে বহুদিনের অভ্যাস, একেবারে চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ধাতে সহিবে না বলিয়াই মোটামুটি আঁকড়াইয়া আছেন এখনো। কিন্তু ব্রীজের জোরালো ডাকের মুখেও একান্ত মনোযোগটা অন্তঃপুরের [illegible]

উৎকর্ণ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে খেলার সময় তিনি এমন এক একটা ভুল করিয়া বসেন যে তাঁহার পার্টনার চটিয়া মটিয়া আগুন হইয়া ওঠে।

তাঁ—দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার প্রতি এতখানি মনোযোগ—আপাত-দৃষ্টিতে এটাকে একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু ভালোবাসিবার ক্ষমতাটা তো আর সকলের সমান নয়। মানুষের চরিত্রগত তারতম্য বিচার করিয়াই ভালোবাসার পাত্রাপাত্র ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। যে বলরাম এতখানি বন্ধুবৎসল, যে তামাক এবং মোদক ব্যয়ের দিকে তাঁহাকে একেবারে অকুণ্ঠ বলিলেই হয়, তিনি যে আত্মীয়াকে একটু অতিরিক্তই ভালোবাসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আত্মীয়াটির নাম মুক্তকেশী—সংক্ষেপে মুক্তো।

বয়স বাইশ তেইশ হইবে। আঁটো-সাঁটো গড়ন, কপালটা অতিরিক্ত চওড়া। কিন্তু প্রশস্ত কপালটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে অশোভন রকমের বড় একটা মেটে সিঁদুরের ফোঁটায়। গ্রামের মেয়ে হইলেও সে পাতা পাড়িয়া সিঁথি কাটে, পুরু ঠোঁট দু'খানি পানের রঙে সর্বদাই রাঙা হইয়া আছে।

সুন্দরী বলিলে যা বোঝায়—মুক্তো ঠিক তা নয়। তবু মুক্তোর শ্রী আছে। বিবাহ হইয়াছে ছোটবেলায়, কিন্তু বিবাহিত জীবনের কোনো ছাপ পড়ে নাই তাহার শরীরে; দেখিলে এখনো কুমারী বলিয়াই মনে হয় তাহাকে। চোদ্দ বৎসর বয়সে গুড়ের মহাজন নবদ্বীপ সরকারের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে স্বামীসেবা করিয়াছে। বিচিত্র ইহাই যে এই পরম নিষ্ঠার কোনো পুরস্কারই সে পায় নাই। পুরা ছয়টি বৎসর আসিল গেল, কিন্তু সরকার কুলধ্বজ কোনও বংশধর আসিয়া তাহার কোল উজ্জ্বল করিয়া বসিল না। শিকড় বাকড়, কালীর দুয়ারে ইঁট বাঁধা, এমন কি পঞ্জিকায়

পেটেন্ট ওষুধ, কিছুই কাজে আসিল না। সুতরাং পুত্রপিণ্ডলোভী নবদ্বীপ আর একবার হাতে মাকু লইয়া ছাঁদনাতলায় ভ্যাঁ করিতে গেল এবং সেই অবকাশে পিতা রাখোহরি সরকার একখানা গোরুর গাড়ি ডাকিয়া পোঁটলা পুঁটুলিসহ মুক্তোকে তাহাতে চাপাইয়া দিল।

তারপর দুইটা বৎসর কাটিল বাপের বাড়িতেই।

কিন্তু পাড়ার দশটা বখাটে ছোক্‌রার অনুগ্রহদৃষ্টি এমনভাবে তাহাকে দিনরাত তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল যে সে অস্থির হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইল। তাহার দায়িত্ব নিতে রাজী হইলেন বলরাম ভিষক্‌রত্ন স্বয়ং—চর ইস্‌মাইলের সভ্যতা-বিবর্জিত দুর্গম দুর্গে বসিয়া পৃথিবীর ফেনাইয়া-ওঠা কলরব ভুলিয়া থাকা যাঁহার পক্ষে সব চাইতে সহজ। শুধু ভার লওয়াই নয়—মুক্তোর প্রতি বলরামের স্নেহটা উদগ্র হইয়া উঠিল।

মিশিবার মতো লোক এখানে নাই। ভদ্রলোক যাহারা আছে তাহারা পত্নীসঙ্গহীন প্রবাস জীবন যাপন করে। অবশ্য তাই বলিয়া নারী সঙ্গহীন নয়। তিনশতাব্দী আগে পর্তুগীজদের সঙ্গে যে আরাকানীর দল এখানে আসিয়াছিল, বাংলা দেশের মাটির স্যাঁৎসেঁতে স্পর্শ লাগিয়া বংশক্রমে নোনা ধরিয়াছে তাহাদের। সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাহাদের মধ্য হইতে নৈশ-সঙ্গিনী সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

কিন্তু তাহাদের সহিত বনাইয়া লওয়া সম্ভব হইয়া ওঠে না। মুক্তোর দিন একাই কাটে একরকম। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া সে দড়ি পাকাইয়া শিকা তৈরী করে, মনে মনে ভাবে সরঞ্জাম পাইলে ছোট মাছের একখানা খেপ্‌লা জালও সে আরম্ভ করিয়া দিতে পারে।

অবসরও অবশ্য খুব বেশি সে পায় না। বলরামের জীবন-যাত্রায় যেন বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া চলিতেছে একটা। বাহিরের জগৎকে এক সময়

খুব বেশি প্রশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় আজ সে জগৎটার উপরে প্রতিশোধ লওয়া চলিতেছে। ওজন করিয়া ধানের বস্তা বড় বড় নৌকায় চাপাইয়া দেওয়া, সুপারীর দাদন লইয়া দর কষাকষি, ইহার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ পাইলেই বলরাম আসিয়া মুক্তোর আঁচলে মাথা গুঁজিতে চান। প্রথম প্রথম মুক্তো খুশি হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল একটু একটু করিয়া সন্দেহ আসিতেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, শুধু আঁচলের আশ্রয় পাইলেই হয়তো বলরাম খুশি হইবেন না।

বাহিরে বন্ধুরা আজো আসিয়া জড়ো হয়। কিন্তু তামাক সরবরাহে রাধানাথের আজকাল উদাসীনতা দেখা দিয়াছে। গির্দা বালিশটার তলায় রাখা তাসজোড়াকে সব সময় জায়গা-মতো পাওয়া যায় না, আবার যখন পাওয়া যায়, তখন এদিকে ওদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া বায়ান্ন-খানার হদিস মিলাইতে হয়।

সবচেয়ে বেশি করিয়া যিনি ব্যাপারটা উপভোগ করেন, তিনি হরিদাস!

হরিদাসের হাসির ভঙ্গিটা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়া ওঠে। হাঁপানির টানের মতো সে হাসিটা বিচিত্রভাবে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। সরু গলা হইতে জিল্‌জিলে বুকখানার উপর ঝুলানো হাঁপানির চৌকোণা মাদুলিটা তাহারি সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া ওঠে, বয়োজীর্ণ কপালের ও গালের কতকগুলি বিশৃঙ্খল রেখা নানা আকারে যেন হাসির স্বরূপটা ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

দেখিয়া, বলরামের সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া ওঠে।

হাসি থামিলে হরিদাস বলেন, বুড়ো বয়সে বুঝি রং লাগছে কবিরাজের?

বলরাম লজ্জিত হন। কিন্তু বর্ণদোষে মুখের উপর লজ্জার রক্তিম

আভা না পড়িয়া কালো রংটির উপর যেন বার্ণিশ লাগাইয়া দেয়। বলেন, যাঃ, কী বলছ।

হরিদাস অকস্মাৎ চোখ দুটি ছোট করিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে বলরামের সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে। ঘরে আর লোকজন না দেখিলে হঠাৎ তাঁহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়েন: বলি, সত্যি সত্যিই গ্রামের মেয়ে তো? সম্পর্কের মধ্যে ভেজাল নেই তো কোনরকম?

বলরাম চমকিয়া বলেন, তার মানে?

হরিদাসের হাসি অশ্লীল হইয়া ওঠে। তারপর কানের কাছে মুখ লইয়া চাপা স্বরে কী যেন বলেন কবিরাজকে।

বলরামের চোখে মুখে সুস্পষ্ট কাতরতার ছাপ পড়ে।

—কী সব আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছ? তোমার মুখে কি কিছুই আটকায়না না কি? ছি—ছি—ছি—

ছি-ছি-র মাত্রাধিক্যে হরিদাস চুপ করিয়া যান। তবু মনে হয় ধিক্কারের মাত্রাটা যেন একটু অসম পরিমাণে অধিক। নিজের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাটাকে অস্বীকার করিবার জন্যই যেন বলরাম এত বেশি পরিমাণে সশব্দ হইয়া ওঠেন। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও হরিদাস কিছুই বলেন না। প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিক অসীম স্বতন্ত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম সামাজিকতার বন্ধনই এখানে ঢিলা হইয়া গেছে। অনুকূল পৃথিবী ও সমাজের দৃঢ় গণ্ডিটির মাঝখানে যেখানে প্রাচুর্য আছে চরিত্রহীনতার নিন্দা সেখানেই সম্ভব; কিন্তু স্থানকালপাত্র হিসাবে সমাজের সংজ্ঞাটাই এখানে বদলাইয়া গেছে। মগ কিংবা আরাকানী অথবা পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি মেয়েদের সত্যি সত্যিই এমন কিছু বিবাহ করা চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পরিধি যেখানে নাই, সেখানে মুক্তো বলরামের

স্বগ্রামবাসিনী অথবা আর কিছু ইহা লইয়া আলোচনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বৃহস্পতিবার। শেষ রাত্রিতে বোট ছাড়িয়াছে। বুকের নীচে বালিশ দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি—সমস্ত পৃথিবীটাকেই বিচিত্র বলিয়া মনে হইতেছে।

অন্ধকারের গাঢ় রংটা ক্রমশ ফিকা নীল হইয়া আসিতেছে। আকাশটার চেহারা দেখিতে দেখিতে কী দ্রুত ভাবেই বদলাইয়া গেল—যেন প্রকাণ্ড একখানা কার্বণ পেপারকে কে উল্টাইয়া ধরিল। তারাগুলির রঙ লাল হইয়া গেছে, একটু পরেই ঘষা কাঁচের মতো ঘোলাটে হইয়া যাইবে। এই মুহূর্তে শুকতারার একটা তির্যক আলোর রশ্মি অদ্ভুত ভাবে আমার চোখমুখে আসিয়া পড়িতেছে।

নিজেকে যেন চিনিতে পারিতেছি না। পিছনের হালের গোড়া হইতে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিয়া গোঙানির মতো কাতর শব্দ উঠিতেছে, পালে বাতাস আর ভাঁটার টান পাইয়া বোট আগাইয়া চলিতেছে তর তর করিয়া। মাঝে মাঝে ভাসিয়া-চলা কচুরির ঝাঁক হইতে পরিচিত এক ধরণের গন্ধ পশ্চিমা বাতাসে নাকে আসিয়া লাগিতেছে। মনে হইতেছে, আমার ভিতর হইতে কে আর একজন বাহির হইয়া আসিয়া এই জল-স্থল-নদী আর আকাশকে অনুভব করিতেছে—এতদিন সে আমার মনে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, তবু কোনো সুযোগে আমি তাহার পরিচয় পাই নাই।

পৃথিবীকে আমরা কতটুকু জানি! আদিমতম যুগে আমাদের যে বর্বর পূর্বপুরুষেরা গুহা-গহ্বরে বাস করিত, পাথরের বল্লম ঘষিয়া হিংস্র জন্তু বধ করিত, প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য হইতে শুকনা ডাল পালা সংগ্রহ

করিয়া আগুন জ্বালাইত, আর সেই চকমকির আগুনে পশুর মাংস আধপোড়া করিয়া ক্ষুধা মিটাইত—তাহারাই তো পৃথিবীকে জয় করিবার সাধনা সুরু করিয়াছে।

তারপরে কতযুগ পার হইয়া গেল। সেই বর্বর মানুষদের মধ্যে বাহুবলে যে বড় হইল, সে হইয়া দাঁড়াইল দলপতি। প্রকৃতি বিশাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চারিদিক হইতে তাহাদের ঘিরিয়া আছে—সে বাধাকে জয় করিবার জন্য সৃষ্টি হইল মন্ত্রতন্ত্রের, রচনা হইল দেবতার। আসিল পুরোহিত বা যাদুকর, তারপর কোন মুহূর্তে তাহার মাথায় সর্বশ্রেষ্ঠত্বের রাজমুকুট আর কপালে নররক্তের রাজটীকা আসিয়া পড়িল, অলিখিত ইতিহাসের পাতা হইতে তাহা মুছিয়া গেছে।

সেই হইইতে সুরু হইয়াছে সংগ্রাম। সমাজের বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অগ্রগামী মানুষ পৃথিবী হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছে। কৌতূহলের আকর্ষণ খানিকটা আছে, কিন্তু দেহে মনে তাহাকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়া, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া যাইবার স্পৃহা তাহার নাই। তাহার জন্য আছে পার্লিয়ামেণ্ট, আছে আইন, আছে গীর্জা এবং ধর্মমন্দির, আছে বিবাহ, আর আছে যুদ্ধ।

ভোর হইয়া আসিতেছে। সামনে শুকতারাটা একখণ্ড শাদা মেঘের তলায় লুকাইয়া গেল। অস্তেই নামিল হয়তো। একটা হালকা কুয়াসা দূরের নদীর ওপর ধোঁয়ার মত ভাসিতেছে, এপার ওপার দেখা যায় না, হঠাৎ চমকিয়া মনে হয়, আমার এ যাত্রা বুঝি কখনো কোনোদিন সমাপ্তির ঘাটে গিয়া পৌঁছিবে না।

কিন্তু পৃথিবী বিচিত্র। মনে হইতেছে, বাহিরের জল-বাতাস হইতে একটা অনাস্বাদিত গন্ধ, একটা অননুভূত স্পর্শ যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়া বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িতে

ভয় করিতেছে আমার। হয়তো জাগিয়া উঠিয়া আমি আমাকে খুঁজিয়া পাইব না—হয়তো দেখিব, আদিম পৃথিবীর আকাশে বাতাসে অসংখ্য জীবাণুর সঙ্গে আমি মিশিয়া গেছি, হয়তো দেখিব প্রথম সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া-বেড়ানো প্রোটোপ্লাজ্‌মের মতো আমি জীবকোষের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। অন্তরের অণু-পরমাণুতে আমি যেন এই মুহূর্তে প্রথম পৃথিবীর ডাক শুনিতে পাইলাম।

কিন্তু কালুপাড়া অনেক দূর। সন্ধ্যার আগে সেখানে গিয়া পৌছানো যাইবে না। সম্মুখে প্রসারিত নদীপথ সকালের আলোয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—সৃষ্টির চিরন্তন রহস্যের মতো দিগন্ত-চক্রবালে তাহা প্রসারিত।

৪

ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, কিন্তু রক্তের জোর মরিয়া যায় নাই। লোকটা অশ্রান্তভাবে খাটিতে পারে। ধান সুপারীর যে কারবার তাহার আছে, তাহা এমন প্রচুর নয় যে তাহাতে নিশ্চিন্তে সম্বৎসর খাইয়া থাকা যায়। সুতরাং ডি-সুজাকে অত্যন্ত খাটিতে হয়। এই বয়সেও তাহাকে নৌকা লইয়া প্রায়ই ঘুরিতে হয়, ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে সহরে যায় দুইবার তাহার নৌকা ডুবিয়াছিল, কিন্তু সে মরে নাই। প্রথম বারে রাতারাতি মাইল ত্রিশেক সাঁতরাইয়া সে পটুয়াখালির এক চড়ায় হোগলা বনে গিয়া উঠিয়াছিল, দ্বিতীয়বারে শ্যামের হাটের খেয়া ডুবিলে সে এক বোঝা পানের সহায়তায় তেঁতুলিয়ার ভৈরব রূপকে অস্বীকার করিয়াই পারে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিল।

সুতরাং ডি-সুজা দুঃসাহসী। এই সমস্ত অঞ্চলের সবরকম বাধার সঙ্গেই সে এক একবার লড়াই করিয়া দেখিয়াছে। ফলে, সে যে শুধু ভয়কেই জয় করিয়াছে তা নয়, ইহার পুরস্কারস্বরূপ ডি-সুজা প্রয়োজনের অনেক বেশি রোজগার করে।

অবশ্য সেটার বাহিরে কোনো প্রমাণ নাই। লোকে সন্দেহ করে, মাটির নিচে কোথাও কোনো প্রচ্ছন্ন ধনভাণ্ডার আছে ডি-সুজার। অক্লান্ত ভাবে সে টাকা জমাইতেছে। কিন্তু এই টাকাটা কোথা হইতে, কী সূত্রে যে আসিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

কোনো আভাস দিলে ডি-সুজা চটিয়া লাল হইয়া যায়।

লোকটার মুখ খারাপ। অশ্রাব্য একটা গালাগালি দিয়া বলে, একটু ভালো দেখছে কিনা, তাই চোখ টাটায় সকলের। আমার টাকা থাক

বা না থাক, আমার যা ইচ্ছে করি বা না করি, তাতে কার কী আসে যায়?

ডি-সুজার সম্পর্কে সমালোচনা করে কিন্তু প্রতিবেশী ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ই বেশি। ইহাদের মধ্যে আবার ডি-সিল্‌ভা অগ্রণী। ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণও আছে ডি-সিল্‌ভার।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। লিসি বড় এবং বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে তাহার সঙ্গে কোর্টশিপ্ করিবার ইচ্ছা অনেকেরই মনে মনে চাড়া দিতেছে। লিসির রংটা তামাটে আর নাকটা থাঁদা হইলেও মোটামুটি সুন্দরীই বলিতে হইবে তাহাকে। তাছাড়া নেপথ্য হইতে ডি-সুজার ধন-ভাণ্ডারের একটা দীপ্তি লিসির মুখে পড়িয়া তাহাকে আরো বেশি সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বলা প্রয়োজন, লিসি ছাড়া ত্রিসংসারে ডি-সুজার আর কেউ আছে বলিয়া কাহারো জানা নাই।

অতএব সাহসে বুক বাঁধিয়া ডি-সিল্‌ভা একদা ডি-সুজার কাছে প্রস্তাবটা করিয়াই ফেলিল।

শুনিয়া ডি-সুজা প্রথমটা বিশ্বাস করিতে পারিল না একরকম। খানিকক্ষণ সে ডি-সিল্‌ভার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো চাহিয়া রহিল, রাজহাঁসের পাখার মতো শাদায়-কালোয় মিশানো তাহার ভ্রূ দুইটা চোখের উপরে যেন দুইটা উল্‌টানো জিজ্ঞাসা-চিহ্নের সৃষ্টি করিল। তারপর সেই উল্‌টা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দুইটা একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। চোখ দুইটা রাগে পিট পিট করিয়া ডি-সুজা বলিল, বটে!

সাহস পাইয়া ডি-সিল্‌ভা কাছে ঘনাইয়া বসিল।

—ভেবে ছাখো, কথাটা নেহাৎ মন্দ বলছি না আমি। যা ভেবেছ, বয়সও আমার তেমন বেশি হয় নি। তা ছাড়া আমার যা কিছু আছে—

বৃদ্ধ ডি-সুজা হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো নাচিয়া উঠিল। আনন্দে নয়, অসহ্য ক্রোধে। দুই হাতের দুইটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডি-সিল্‌ভার নাকের সামনে দোলাইয়া বলিল, তোমার আছে এই কাঁচকলা! তা ছাড়া ওই নাদা পেট, আর চল্লিশ বছরের একটা টাক—কথাটা বলতে একবার লজ্জা করল না?

ডি-সিল্‌ভা চটিয়া গেল: আমার নাদা পেট, আর তোমার পেট বুঝি আমার চাইতে ছোট? নাত্নীর বয়সও তো পঁচিশ পেরোতে চলল তার হিসেব আছে?

—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ভালো মানুষের মতো সুড় সুড় করে বেরোও তো আমার বাড়ী থেকে।

—কা! অপমানে ডি-সিল্‌ভার মোটা পেটটা একটা বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিল: আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে চাও!

—হাঁ! যাও—বেরোলে না? বটে, মতলব আমি যেন কিছু আর বুঝতে পারি না। প্রথম থেকেই দেখছি নজর আমার মুরগীর খোঁয়াড়ের দিকে। বড় মোরগটা নিয়ে কী ভাবে সটকে পড়বে তারই সুযোগ খুঁজছ! আর দ্বিতীয়বার লিসিকে বিয়ে করতে চেয়েছ কি—হয় টাক ফাটিয়ে দেব, নইলে ভুঁড়ি দেব ফাঁসিয়ে। মনে রেখো কথাটা। —ডি-সুজার মূর্তি প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল।

একপা একপা করিয়া খিড়্‌কির দিকে পিছাইতে লাগিল ডি-সিল্‌ভা। পেট এবং বুদ্ধি লোকটার একটু বেশি পরিমাণে স্থূল, সাহসের মাত্রাটাও সেই অনুপাতে কম। কেবল যাইবার সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া গেল, মেরীর নাম করে বলছি, এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সিল্‌ভা ভীরু মানুষ, সুতরাং অনেকটা হাল ছাড়িয়াই দিল সে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার রসনা মরিয়া গেল না। ডি-সুজা সম্বন্ধে

নানারকম অলীক গাল-গল্প ছড়াইয়া বেড়ায় লোকটা। শুধু গাল-গল্পই নয়, গালাগালিও করে।

বলে, হতভাগা বুড়ো মরে জিন হয়ে থাকবে।

কিন্তু জোহানকে আঁটিবার জো নাই। ছেলে বেলা হইতেই সে ডি-সুজার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে, লিসির সঙ্গে একত্র হইয়া খেলা করিয়াছে। চট্ করিয়া তাহাকে কিছু একটা বলিয়া বসা যায় না। তা ছাড়া সে কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব লইয়া কখনো সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও ডি-সুজা অনুভব করে, তাহার অজ্ঞতার পশ্চাতে থাকিয়া একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে জোহান লিসিকে তাহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে, লিসির মনোজগতে ডি-সুজা এখন অনেকটা নেপথ্যে।

এই কারণেই জোহানকে দেখিলে তাহার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া যায়। ডি-সিল্‌ভাকে দেখিলেও বোধ হয় তাহার একটা বিদ্বেষ বোধ হয় না। অনেকটা এই আর মনোভাবের জন্যই বড় মুরগীটা অপহরণের দায়িত্ব জোহানের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া সে শান্ত হইতে চায়।

কিন্তু লিসির বিবাহ দিতে তাহার যে নিতান্ত অনিচ্ছা, তা নয়। আগে হইলে কী হইত বলা যায় না, হয়তো অসংকোচেই সে জোহানের হাতে লিসিকে সঁপিয়া দিতে পারিত; কিন্তু সুনিশ্চিত একটা আলোকে সেটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার আগেই নূতন রাহুর ছায়া পড়িল সেখানে। সেই হইতে পাত্র তাহার ঠিক হইয়াই আছে। এবং ডি-সুজার মতে এমন সুপাত্র দুর্লভ।

পাত্রটির নাম গঞ্জালেস্।

গঞ্জালেস্ দেখিতে সুপুরুষ। ছয় ফুট দীর্ঘ চেহারা, গায়ের তাম্রাভ বর্ণে এখনো আর্যামির খাদ আছে। চোখের তারা পুরোপুরি কালো নয়; চুলগুলিকে মোটামুটি কটা বলা যাইতে পারে। চোয়ালের

প্রশস্ত ভুখানি হাড়ের মাঝামাঝি দীর্ঘ নাসাটি খড়োর মতো সমুন্নত হইয়া আছে।

চট্টগ্রামে তাহার শুঁটকি মাছের কারবার। নিম্ন বাংলা হইতে সুরু করিয়া "ডাম্পির" দেশ ব্রহ্ম এবং চীনের উপকূল পর্যন্ত তাহার ব্যবসা বিস্তৃত। আরাকানী রক্তের মিশাল থাকিলেও গঞ্জালেস্ মূলত এখনো পর্তুগীজ। পূর্বপুরুষদের দস্যুবৃত্তি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিটাকে গঞ্জালেস্ আজ পর্যন্ত জীয়াইয়া রাখিয়াছে। নানা ঘটনাচক্রে ডি-সুজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং সেই হইতেই ডি-সুজা তাহাকে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছে। গঞ্জালেস্ প্রতিশক্তিশালী লোক। তাহার আশ্রয় থাকিতে পারিলে কাজটা যে অনেক নিরাপদেই চালানো যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তা ছাড়া গঞ্জালেসের আর একটি বিশেষত্ব আছে। সেটাও ডি-সুজাকে আকর্ষণ করে কম নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নিম্ন বাংলায়, বিশেষ করিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের যে অত্যাচার সুরু হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের উগ্র-গোঁড়ামির সহিত দস্যুতার অবাধ প্রেরণা মিশ্রিত হইয়া পর্তুগীজেরা প্রেত-তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কোনো শাসন-শক্তি তাহা সংযত করিতে পারিত না, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের একেবারে প্রত্যন্ত সীমায় আসিয়া সমুদ্রচারী এই দস্যুদলকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল।

তখন বাঙালির বহির্বাণিজ্য ছিল। সিংহল, জাভা, বলী, সুমাত্রা, শ্যাম এবং সুদূর চীন জাপানেও বাঙালি সওদাগরেরা সপ্ত-ডিঙা-মধুকর ভাসাইয়া বেসাতি করিতে যাইতেন; 'বস্তু বদল' করিয়া হরিদ্রার পরিবর্তে

আনিতেন স্বর্ণ, আর্দ্রকের পরিবর্তে মুক্তা এবং নারিকেলের বিনিময়ে গজমোতি। 'মঙ্গল-কাব্যে'র রূপকথার পৃষ্ঠাগুলিতে সে সমস্ত দিনের এক একটা স্বপ্নময় রূপ আজো দেখিতে পাওয়া যায়।

বড় বড় নদীর ধারে, সমুদ্রের মোহনায় তখন সমৃদ্ধ জনপদের অন্ত ছিল না। এখন যে সুন্দরবনের ছায়াগভীর অন্ধকারের মধ্যে রয়্যাল্ বেঙ্গল টাইগারের ক্ষুধার্ত চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে, বড় বড় নলঘাস আর হিজল বনের আড়ালে আড়ালে শংখচূড়ের বিষাক্ত বিশাল ফণা তুলিয়া ওঠে, আর খাঁড়ির ধারে ধারে—জোয়ারের জল নামিয়া গেলে যেখানে ঝিনুকের অসংখ্য আঁকা-বাঁকা লেখা পড়ে—বড় বড় মানুষ-খেকো কুমীর শালগাছের গুঁড়ির মতো পড়িয়া রোদ পোহায়, ওখানেও একদিন মানুষের বসতি ছিল। সুন্দরীগাছ আর লতাপাতার অজস্র জটিলতা ভেদ করিয়া আরো একটু ভিতরে ঢুকিয়া দেখো, চোখে পড়িবে ঘন জঙ্গলে-ঘেরা মস্ত মস্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মজিয়া-আসা দীঘির শেষ চিহ্ন। কোথাও কোথাও এখন সাঁই ফকিরদের ধুনি জ্বলে, কোথাও বা বাঘিনী কাচ্চাবাচ্চা লইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে, আবার কোথাও বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর মানুষের দল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুল দুলাইয়া খাঁড়া-শড়কিতে শান দিতেছে।

খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত জায়গা এমনি ভয়ংকরের পীঠস্থান ছিল না। তখন এখানে মানুষ বাস করিত—উৎসব চলিত—বড় বড় নদীর মোহনায় নতুন নতুন উপনিবেশ বসিয়া বাঙালির ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এই ক্রম-বিবর্ধমান সমৃদ্ধি বেশিদিন রহিল না। ভাস্কো-ডা-গামার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া হার্মাদেরা একদিন সর্বগ্রাসী পঙ্গপালের মতো বাংলার এই বাণিজ্য অঞ্চলগুলিতে আসিয়া হানা দিল।

যুদ্ধবাদী দুঃসাহসিক জাতি এই পর্তুগীজেরা। নিজেদের দেশ তাহাদের ঊষর ও অনুর্বর—দারিদ্র্য সেখানে লাগিয়াই আছে। এই দারিদ্র্যকে জয় করিবার জন্য একদল বেপরোয়া মানুষ সমুদ্রের উপর দিয়া অলক্ষ্যের পানে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তৃণতরুবিরল পর্তুগালের রুক্ষ উপকূল হইতে যখন তাহারা বাংলা দেশের উচ্ছল-শ্যামলতা-মণ্ডিত সমৃদ্ধ তীরতট দেখিতে পাইল, যখন দেখিল অনুকূল বাতাসে আকাশছোঁয়া রাশি রাশি পাল উড়াইয়া ধনপতি, শংখপতি অথবা পুষ্পদত্ত সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙা দেশ-বিদেশের মণি-মুক্তা লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, তখন তাহাদের আর মাথা ঠিক রহিল না। রাত্রির ঘুমন্ত শান্ত আকাশকে শিহরিত করিয়া তাহাদের রক্তরাঙা মশালগুলি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাদের বন্দুকের গর্জনে নিদ্রিত পল্লীর তন্দ্রা টুটিয়া গেল। যুদ্ধবিমুখ, সচ্ছলতায় পরিতৃপ্ত ক্ষীণকায় বাঙালি এই নতুন শক্তির আক্রমণের মুখে শিশুর মতো অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল।

সে অত্যাচারের তুলনা নাই। ভারতবর্ষে শক আসিয়াছে, হূণ আসিয়াছে, তৈমুরলঙ্গ নাদির শাহের আবির্ভাবে রক্তবন্যা বহিয়া গেছে; কিন্তু আরাকানী ও পর্তুগীজের দল তলোয়ারের মুখে সেদিন যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, নাদির শাহের রক্তলোলুপতাও তাহার কাছে হার মানিয়া যায়।

সে অত্যাচারের সীমা ছিল না—বিচার ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ কেহই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। চৌদ্দ-ডিঙা মধুকরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেগুলি বঙ্গোপসাগরের নোনা জলে ডুবিয়া গেল, রাশি রাশি মৃতদেহ জোয়ারের জলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল আর সুন্দরবনের কূলগুলিতে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল। বাঙালির বাণিজ্য-যাত্রা

চিরদিনের মতো বন্ধ হইল, সমুদ্রযাত্রার উপরে শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন বসিয়া গেল।

উপদ্রব তাহাতেই থামিল না। নদী সমুদ্র ছাড়িয়া পর্তুগীজেরা এবার গৃহস্থ পল্লীতে অভিযান আরম্ভ করিয়া দিল। হত্যা ও লুণ্ঠন তাহারা নির্বিচারে করিত। বয়োবৃদ্ধ ও অক্ষমদের হত্যা করিয়া সমর্থ যুবকদের বাঁধিয়া লইয়া যাইত—ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিবার জন্য। মেয়েদের উপরে তো অত্যাচার আর নৃশংসতার সীমাই ছিল না। পশুর মতো যথেচ্ছ উপভোগ করিয়া দেশ-বিদেশে তাহাদের বিক্রয় করা হইত। হাতের চেটোয় গর্ত করিয়া সরু বেতের সাহায্যে যেভাবে তাহারা এই সব বন্দীদের 'হালি' গাঁথিয়া রাখিত এবং পাখির আধারের মতো যে ভাবে মাটিতে আধসেদ্ধ ভাত ছড়াইয়া তাহাদের খাইতে দিত—বর্বরতার নিদর্শন হিসাবে সে-সমস্ত কাহিনী অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এবং বার ভুঁইয়ার কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলী প্রভৃতির সাহায্যে ইহাদের দমন ঘটিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের অত্যাচার আবার প্রবল হইয়া ওঠে। এই সময় ইহাদের নেতা হইয়া দাঁড়ান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্। এই সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্ যে দুর্ধর্ষ জলদস্যুবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং নদীর মোহনায় ছোট ছোট চরে ইহাদের যে-সমস্ত দুর্গ ছিল, সেই দুর্জয় বাহিনী ও দুর্গগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে বাংলার নবাব আলীবর্দীকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। চর ইস্‌মাইলও পর্তুগীজদের সেই গৌরবদিনগুলিরই ভগ্নাবশেষ মাত্র।

গঞ্জালেস্ এই সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্র না থাকিলেও সিবাস্টিয়ানের রক্ত তাহাতে আছে।

শুধু সিবাস্টিয়ানের নয়। গঞ্জালেস্ নিজের মধ্যে নাকি হিন্দুদের

প্রভাবও কিছু কিছু অনুভব করে। সে সম্পর্কে তাহাদের পরিবারে ভারী চমৎকার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সেটা তাহারই কোনো ঊর্ধতন পূর্ব-পুরুষের গৌরব কীর্তির কাহিনী।...

...অবশ্য কয়েক শত বৎসর আগেকার কথা। কোনো এক গঞ্জালেসের কাছে সংবাদ আসিল কয়েক মাইল দূরে এক জমিদার বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। খবরটা পাইয়া গঞ্জালেসের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহাদের লাভ বেশি। অনেকগুলি মানুষ, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোককে একত্রে পাওয়া যায়, তা ছাড়া লুণ্ঠনের মন্দ সুবিধা হয় না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। জমিদার বাড়ীতে তোরণে নহবৎ বাজিতেছে, আলোয় চারিদিক আলোময়, কলরব কোলাহলে উৎসব রাত্রি মুখরিত। বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লগ্নের দেরী নাই, অন্তঃপুরে মেয়েকে কনে-চন্দনে সাজানো হইতেছে।

কিন্তু মুহূর্তে সে উৎসবের সুর কাটিয়া গেল।

বন্দুকের শব্দ আর মশালের আলো—অর্থটা বুঝিতে কাহারো এক মুহূর্ত দেরী হইল না। দু'চারজন পাইক পেয়াদা যাহারা বাধা দিতে সম্মুখে দাঁড়াইল, বন্দুকের গুলিতে তাহারা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বাকী সকলে প্রাণ লইয়া কে যে কখন কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইল, তাহার আর ঠিকানাই মিলিল না। শশাঙ্ক-নরেন্দ্রের যুগের বাঙালি তাহারা নয়, কাশ্মীরের পরিহাসকেশব বিগ্রহ যাহারা চূর্ণ করিয়াছিল তাহারাও নয়; পালানোটাই তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল।

বরযাত্রীরা পলাইল বটে, কিন্তু বর কোথা হইতে এক গাছা সড়কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, পরণে রক্ত চেলি, সুশ্রী মুখ চন্দন-লেখায় চর্চিত। তাহার পেশল বাহুতে সড়কির উজ্জ্বল

ফলকটি একবার থর থর করিয়া কাঁপিল, পরক্ষণেই সেটা সোজা নিক্ষিপ্ত হইল একেবারে গঞ্জালেসের বুক লক্ষ্য করিয়া। চট্ করিয়া সরিয়া গিয়া গঞ্জালেস্ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু তাহার পাশের লোকটি বিকট কণ্ঠে একটা আর্তনাদ করিয়া সোজা মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। চক্ষের পলকে বর সড়কিটা আবার হাতে তুলিয়া লইল এবং গঞ্জালেসের বাম-বাহুর পাশ দিয়া আর একজন পর্তুগীজের কণ্ঠ ভেদ করিল।

কিন্তু পর্তুগীজেরা আর নিশ্চেষ্ট রহিল না। এক সঙ্গে চার পাঁচটি বন্দুক গর্জিয়া উঠিল, বর রক্তাক্ত দেহে পৃথিবী গ্রহণ করিল। ভারী বুটজুতার তলায় তাহার দেহটাকে নির্মম ভাবে মাড়াইয়া গঞ্জালেস্ ও তাহার দল ঢুকিল অন্তঃপুরে।

অন্তঃপুরের রুদ্ধ দুয়ার তাহাদের আঘাতে ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল—ভীতা কাতর নারীসংঘের সামনে দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ আনন্দধ্বনি করিল। তারপর মালায় চন্দনে সাজানো ক'নেটির দিকে তাকাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল—এত রূপ! বাঙালি মেয়ে যে এত সুন্দরী হইতে পারে সে তাহা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। এক মুহূর্ত সে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হাত বাড়াইয়া মেয়েটাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।...

লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এবং স্ত্রী-পুরুষের সঞ্চয় লইয়া পর্তুগীজদের জাহাজ আবার যখন নদীতে ভাসিয়া পড়িল, তখন সেই বিশাল জমিদারবাড়ী আগুনে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া পৈশাচিক ভাবে একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করিল গঞ্জালেস্। বলিল, সব ঘরে আটকে রেখে এসেছি, মর্ ব্যাটারা, এখন ওখানে ইঁদুরের মতো পুড়ে মর্।

...সেই কনেটিই বিংশ শতাব্দীর গঞ্জালেসের কোনো এক অতিবৃদ্ধ

প্রপিতামহী। তাই গঞ্জালেস্ মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া বলে, আমি তো আধাআধি হিন্দু।

...অতীতের এই গৌরবময় ইতিহাসটা পেছনে আছে বলিয়াই ডি-সুজা গঞ্জালেস্‌কে এক হিসাবে শ্রদ্ধা করে। ডি-সুজা নিজে বাঙালি হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে বটে, কিন্তু পিতৃপুরুষের কীর্তি কাহিনী স্মরণ করিয়া এখনো গর্বে ফুলিয়া ওঠে তাহার মন। এ জন্য গঞ্জালেস্ আসিলে সে যে কী ভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিবে তাহা যেন ভাবিয়াই পায় না।

কিন্তু লিসির মনোভাব এখনো কিছু স্পষ্ট করিয়া জানা যায় নাই। গঞ্জালেস্-সম্পর্কে তাহার ব্যবহারটা খুব পরিষ্কার নয়। তবে তাহাকে দেখিলে সে যে ডি-সুজার মতো অতিরিক্ত উল্লসিত হইয়া ওঠে না এ তো চোখের উপরেই দেখা যায়। অবশ্য তাই বলিয়া এখনো এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে লিসি গঞ্জালেসের পক্ষপাতী নয়।

ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এর মূলে কোথায় যেন জোহানের প্রভাব আছে। কথাটা ভাবিতেও সে হিংস্র হইয়া ওঠে। বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে জোহান। আচ্ছা দাঁড়াও, বেশিদিন এসব আর চলিতেছে না। এবার গঞ্জালেস্ আসিলেই হয়।

৫

শীতের গোড়া হইতেই চরের আনাচে-কানাচে বুনোহাঁস পড়িতে সুরু করে।

চরের দক্ষিণ-প্রান্তে সেই কবে একটা ছোটখাটো বিলের সৃষ্টি হইয়াছিল, আশ্বিন-কার্তিক হইতেই সেখানে শাপ্‌লা শালুকের ফুল ফুটিয়া ওঠে। এক জাতীয় ক্ষুদে কচুরীতে বেগুনে রঙের রাশি রাশি ফুল ফোটে, নীল শ্যাওলা আর জলজ-ঘাসের মধ্যে সেগুলি সূর্যের আলোয় জল্ জল্ করে। তারপর কোনও এক রাত্রে আকাশ যখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ধুইয়া গেছে, বাতাস আচমকা থামিয়া গিয়া পর্তুগীজদের ভাঙা গির্জাটার নীচে জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে নোনা গাঙের জল থম থম করিতেছে—তখন অনেকগুলি পাখার দ্রুত-বিধূননে ঘুমন্ত রাত্রির যেন সুর কাটিয়া যায়। তেঁতুলিয়ার জল হঠাৎ কল্ কল্ করিয়া ওঠে, নানা রঙের পাখায় জ্যোৎস্নার গুঁড়া-আবির মাখাইয়া বুনো হাঁসের দল ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

জিনিটা লইয়া অবশ্য কবিতা লেখা চলে। কিন্তু প্রয়োজনের চাইতে কবিতার দাম বেশি নয়। তা ছাড়া চর ইস্‌মাইলের এই নিঃসঙ্গ বিশেষ পরিস্থিতিটির মধ্যে কবিতার অবকাশ কম। প্রকৃতির সব রকম বিরুদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষকে অপ্রাকৃতের ভাবনা ভাবিলে চলে না।

সুতরাং সকালের দিকেই জোহান একটা গাদা-বন্দুক লইয়া বিলে হাঁস শিকার করিতে আসিয়াছিল

বিল নেহাৎ ছোট নয়। কল্‌মি আর বুনোঘাস এবং আল্‌গা-হোগলার বন পার হইয়া প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি দ্বীপের মতো উঁচু

জায়গা। হাঁসের দলটা প্রধানত সেই দ্বীপটুকুর উপরেই বসিয়া আছে। সংখ্যায় ষাট সত্তরটির কম হইবে না। কোনো কোনোটা পালকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আছে, কয়েকটা এদিক ওদিক কাছাকাছি ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং দু'একটা কারণে অকারণে উড়িয়া উড়িয়া এদিক হইতে ওদিকে পড়িতেছে।

লোভে জোহানের চোখ জ্বলিতে লাগিল। সবে দু'তিনদিন হইল হাঁস পড়িয়াছে এখানে, এখনো 'ফায়ার' হয় নাই। নতুবা হাঁসগুলি আরো সতর্ক হইয়া যাইত।

সরু একটা বেতের সাহায্যে জোহান বারুদ এবং একরাশ চার নম্বরের ছর্‌রা বন্দুকে গাদাইয়া লইল। কিন্তু হাঁসগুলি 'রেঞ্জে'র বাহিরে। জোহান এক মুহূর্ত দ্বিধা করিল, গায়ের জামা এবং গেঞ্জী খুলিয়া হোগলা বনের মধ্যে রাখিল, তারপর বলের জলে নামিয়া পড়িল।

জল খুব বেশি নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা নরম কাদা আর শ্যাওলায় তাহার বুক পর্যন্ত ডুবিয়া গেল। বন্দুকটাকে মাথার উপর তুলিয়া ক্ষুদে কচুরীর আড়ালে আড়ালে অত্যন্ত হুঁশিয়ার ভাবে আগাইতে লাগিল জোহান। ভাগ্যে বাতাসটা বহিতেছে অন্যদিকে। নতুবা হাঁসেরা এতক্ষণে ঠিক তাহার বন্দুকের গন্ধ পাইত—শিকারীদের চাইতে আত্মরক্ষার সহজ চেতনা এবং প্রচেষ্টা তাহাদের অনেক প্রবল।

এতক্ষণে জোহান হাঁসগুলির প্রায় চল্লিশ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। ইহার চাইতে ভালো সুযোগ সচরাচর দেখা যায় না। একচোখ বুঁজিয়া ঘোড়ায় আঙুল ছোঁয়াইয়া জোহান লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই কাছাকাছি আর কোথাও বন্দুকের শব্দ হইল 'দুম্' করিয়া। জোহান অনুভব করিল, ঠিক তাহার মাথার এক ইঞ্চি

উপর দিয়া শাঁ করিয়া একটা গুলি বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই মাথাটাকে জলের কাছাকাছি নত না করিলে আর একটা গুলি তাহার কপাল ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত।

ভয়ে আতঙ্কে হাতের বন্দুকটা লইয়াই জোহান বিলের জলে ডুব মারিল এবং পঙ্কিল জল ও কল্‌মি দামের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে একটা ডুব সাঁতার কাটিয়া প্রায় দশবারো হাত দূরে একরাশ হোগলার মধ্যে গিয়া মাথা তুলিল। তারপর ব্যাপারটা আরো কতদূর ঘটে, সেটা দেখিবার জন্তই ভীত চক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুই আর ঘটিল না। গুলি যে ছুঁড়িয়াছিল, আশে-পাশে জঙ্গলগুলির মধ্য দিয়া সে যেন মন্ত্রবলেই অদৃশ্য হইয়া গেছে। সুধু তখনো সমস্ত বিল ভরিয়া গন্ধকের গন্ধ ভাসিতেছে আর একটা হালকা নীল ধোঁয়া রেখার মতো বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। আর সমস্ত আকাশ ছাইয়া উড়ন্ত বুনো হাঁস, কাদাখোঁচা এবং বকের তীক্ষ্ণ চীৎকার ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জোহান জল হইতে উঠিয়া আসিল। আশে-পাশে কোথাও কোন মানুষের সাড়া নাই। শিকারের সময় বিলে সর্বদাই বন্দুকের শব্দ শোনা যায়, তাহাতে কাহারো কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। তীরে উঠিয়া জোহান দেখিল, হোগলা বনের মধ্যে যেখানে সে তাহার গায়ের জামা ও গেঞ্জি রাখিয়াছিল, তাহারই অনতিদূরে মাটিতে দুইটা রয়্যাল্ এক্‌সপ্রেসের খালি টোটা পড়িয়া আছে। আর তাহারই পাশে নরম কাদার উপর এক জোড়া জুতার চিহ্ন।

জোহান ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, জুতার চিহ্নটা যেন চেনা চেনা ঠেকিতেছে। সাধারণত এই ধরণের জুতা বর্মিরাই ব্যবহার করে।

বলরাম ভিষকরত্ন কয়েকদিন ধরিয়াই অত্যন্ত চিন্তান্বিত বোধ করিতেছিলেন। অসুবিধা বাধিয়াছে মুক্তোকে লইয়া। সে আর এখানে থাকিতে রাজী নয়—দেশে ফিরিতে চায়। এ ভূতের দেশ এবং মুক্তো নিশ্চয়ই সে ভূতের দলের একজন নয় যে এখানে মাটি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে।

বলরাম মহা সমস্যায় পড়িয়া কহিলেন, কেন, বেশ তো আছ। অসুবিধের এমন কী হয়েছে?

মুক্তো ঝাঁজিয়া বলিল, অসুবিধের কী হয় নি? মানুষ নেই, জন নেই, আছে কতকগুলো অদ্ভুত জীব। তাদের কথাই তো বোঝা যায় না। তুমিও তো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পড়ে থাকো, আমার দিন কাটে কী করে?

বলরামের কণ্ঠে করুণতার আমেজ আসিল: কী বলছ, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই থাকি। তুমি আসবার পরে তো একরকম সবাইকেই ছেড়ে দিয়েছি মুক্তো। কাল পোস্টমাস্টার এসেছিল, তাকেও শুধু এক ছিলিম তামাক খাইয়েই বিদেয় দিয়েছি।

মুক্তো রুষ্ট হইয়া বলিল, তোমার ওই পোস্টমাস্টার মানুষটি বাপু সুবিধের নয়, ওকে দেখলেই কেন যেন আমার গায়ের মধ্যে শির শির করে। লোকটার চেহারা যেন ভূতুড়ে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু একটা অলক্ষুণে ঘটাবার চেষ্টায় আছে ও।

বলরাম দ্বিধা করিতে লাগিলেন। পোস্টমাস্টারের রসনা সব সময়ে প্রীতিকর নয়; তাঁহার কাহিনী এবং কল্পনাগুলি বলরামকে প্রায়ই আতঙ্কিত করিয়া তোলে। তা সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে বলরামের যেন একটা স্নেহগত দুর্বলতাই আছে। এক কথায় বলিতে গেলে, মুক্তো ছাড়া এই চর ইস্মাইলে মাত্র হরিদাসকেই তাঁহার যাহোক কিছু ভালো লাগে।

বলরাম বলিলেন, না, তা ঠিক নয়—হরিদাস মানুষটা খুবই ভালো। তবে মাঝে মাঝে ওর একটু পাগলামি চাপে, তা—

মুক্তো বলিল, মরুক গে। তুমি কবে আমাকে দিয়ে আসবে সেটা ঠিক করে বলো। আমার আবার সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে তো।

বলরামের স্বর প্রগাঢ় হইয়া আসিল : তুমি বুঝতে পারছ না মুক্তো, এখানে একরকম একলা দিন কাটাই। কেউ নেই যে একটু যত্ন করে, কেউ নেই যে দুটো জিনিস ভালোমন্দ রেঁধে দেয়। থাকবার মধ্যে আছে ওই রাধানাথ, তাও তো দেখছই—ও ব্যাটা ফাঁকি দেবার যম।

মুক্তোর করুণা হইল না। সে নির্দয় ভাবেই বলিল, তার আমি কী করব! আমি তো আর তোমার সংসার নিয়ে এই ভূতের দেশে পড়ে থাকতে পারব না।

বলরাম সাহসী হইয়া উঠিলেন, একটু একটু করিয়া মুক্তোর কাছে ঘনাইয়া বসিলেন।

—সত্যি বলছি মুক্তো, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমি, আমি তোমাকে—বলরাম বার তিনেক ঢোঁক গিলিলেন, কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

বিদ্যুৎবেগে মুক্তো বলরামের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল, তাহার দুই চোখের কোণে কোণে খানিকটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি প্রকাশ পাইল। কথার ভাবে মনে হইল যেন আতঙ্কে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

—ছি, ছি—কী বলছ! দেখাশুনো করবার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছ, আর তোমার মুখে এই কথা!

বলরামের ব্যগ্রতায় বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

—তোমাকে নইলে আমি বাঁচতে পারব না মুক্তো। তা ছাড়া এ হচ্ছে

পাণ্ডববর্জিত দেশ, পৃথিবীর বাইরে। এখানে কোনো আইন-কানুনের বাঁধাবাঁধি নেই—কেউ কিছু জানবে না। তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।

উত্তরে মুক্তো শুধু উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ফলাফল যাই হোক, অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশে ফেরাটা স্থগিত রহিল মুক্তোর। খারাপ দিনকাল আসিয়া পড়িতেছে—কিছুদিনের মধ্যেই নদীতে রোলিং স্থরু হইবে। এমন সময় প্রাণ হাতে করিয়া ভাসিয়া পড়িলে যে লাভ কী—বলরাম তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

স্থতরাং মুক্তো রহিয়া গেল। তারপর একদিন রাত্রে যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে, বাতাসে চর ইস্‌মাইলের স্থপারীর বন দুলিতেছে, আর বজ্রের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে তেঁতুলিয়ার জল, তখন মুক্তো এই স্বষ্টিছাড়া দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

ফসল

১

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়া গেল।

অবশ্য খুব সমারোহ করিয়া নয়। নোনা মাটিতে ফুল ফুটিতে চায় না। আশে পাশে গাঙের জলে টান ধরিয়া যায়, নদীর ঘন গৈরিকবর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিবার উপক্রম করে। নদীর ধারে নরম পলিমাটির উপর ত্রিশূলের মতো ছোট ছোট পদচিহ্ন আঁকিয়া স্নাইপের দল শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে বড় বড় পাখা দুলাইয়া ফুট্‌ফুটে শাদা একরাশ পেঁজা তুলার মতো এক এক জোড়া চখা-চখা আসিয়া এখানে ওখানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবার তেমনি করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঈথার-সমুদ্রে শব্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া হাঁসের দল অনির্দেশ অভিমুখে ফিরিয়া যায়—হয়তো কাশ্মীরে, হয়তো মানস সরোবরে, হয়তো বা আরো দূরে।

ঝড়বৃষ্টির দিন আসিয়া পড়িতেছে। কয়দিন হইতেই অত্যন্ত গুমোট গরম। দুপুরবেলা আকাশটা যেন একটা কাঁসার পাতের মতো জ্বলে, সেদিকে তাকাইতেও চোখ ঝলসিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে দমকা বাতাস আসে, সুপারি নারিকেলের বন যেন পাগলের মতো মাথা কুটিতে থাকে।

পোস্টমাস্টারের মনটা খারাপ হইয়া যায়। আকাশে বাতাসে যেন একটা অসীম উদাসীনতা। দূর দিগন্ত হাত বাড়াইয়া আকুল অন্তরের যাযাবরটিকে ডাক পাঠাইতে থাকে। সম্মুখে অজ্ঞাত পৃথিবী একখানা খোলা পাতার মতো মেলা রহিয়াছে। অক্ষরগুলিকে পড়িতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়, চর ইস্‌মাইলের প্রত্যন্ত ছাড়াইয়া এক একদিন জ্যোৎস্না

রাত্রিতে ওই হাঁসের দলের মতো অলক্ষ্যের সন্ধানে ভাসিয়া পড়িতে! সুসঙ্গের পাহাড়, সাঁওতাল-পরগণার শালবন, জয়পুরের মরুভূমি, মাদুরার সমুদ্রতীর। হুঁকা হাতে করিয়া পোস্টমাস্টার বসিয়া থাকেন, গলার তাবিজটাকে পর্যন্ত অতিশয় ম্লান দেখায়।

কেরামদ্দি আসিয়া বলে, বাবু আমি বাজারে চললুম। ভাতটা চাপিয়ে দিয়েছি। ধরে না যায়, নামিয়ে রাখবেন।

পোস্টমাস্টার বলেন, হুঁ।

কেরামদ্দি চলিয়া যায়। ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিতে থাকে। দু-একজন লোক আসে, কেউ একখানা পোস্টকার্ড, কেউ একটা মণিঅর্ডার। তারপরেই আবার সব নিঝুম হইয়া পড়ে। দূর হইতে বড় বড় নৌকার মাস্তল দেখা যায়।

খানিক পরেই সচেতন হইয়া ওঠেন পোস্টমাস্টার। স্টোভের একটানা আওয়াজটা ওঘর হইতে কেমন যেন শোনা যাইতেছে। বাতাসে পোড়া ভাতের পরিষ্কার গন্ধ। কেরামদ্দি ভাতটা নামাইয়া রাখিবার কথা বলিয়া গিয়াছিল বটে।

পোস্টমাস্টার পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া আস্তে স্টোভটি নিভাইয়া দেন। ভাতগুলি পুড়িয়া একেবারে লাল হইয়া গেছে। আবার না রাঁধিলে মুখে তোলা যাইবে না। অবশ্য এক বেলা না খাইলেও এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তা ছাড়া শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে—হয়তো আজ আবার তেমনি করিয়া হাঁপানির টান উঠিবে।

যাযাবর মনটাকে বিশ্বাস নাই। একদিন গভীর রাত্রিতে গীর্জার ঘাট হইতে ছোট একখানা এক মাল্লাই নৌকা লইয়া সেখানাকে সুদূর দিগন্তে ভাসাইয়া দিলে কেমন হয় কে জানে। স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইবে বঙ্গোপসাগরের মোহনায়—দৌলত-খাঁর বন্দরের

আলো যেখানে চোখে দেখা যায় না—সেখানে দিগন্ত-মেখলায় চর কুকুয়ার শেষ নারিকেল বীথিও ছোট একটা বিন্দুর মতো অস্পষ্ট হইতে আরো অস্পষ্ট হইয়া ধূ ধূ আকাশের নীচে মিলাইয়া গেছে।

—তারপর? তার পরের ইতিহাস কে জানে? এই সমুদ্রের কি শেষ আছে? এই পথের কি কোনোদিন সমাপ্তি ঘটিবে? এই লবণ-সমুদ্রে কোথাও যদি ফলে-পুষ্পে-ঘেরা একটা প্রবালের দ্বীপ চোখে পড়িয়া যায় তো সেখানে তিনটি দিন কাটাইয়া আবার নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। অবশেষে যখন এমন দিন আসিবে যে আকাশ আর সমুদ্রের কোনো কূল-কিনারা নাই, ফল নাই, জল নাই—তখন হয়তো অসহ্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এই জীবনটার উপর দিয়া নামিবে শেষের যবনিকা। ছোট নৌকাখানির উপরে শরীরের মাংস গলিয়া পচিয়া ঝরিয়া গিয়া একটা শুকনো হাড়ের পঞ্জর দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে শুকাইতে থাকিবে।…

—হুম্।

পোস্টমাস্টার চমকিয়া উঠিলেন। ঘরে ঢুকিয়াছেন বলরাম ভিষকরত্ন। একটা বিচিত্র প্রসন্নতায় চোখের তারা নাচিতেছে যেন। বলরামের এমন প্রসন্ন মুখভাব অনেক কাল দেখেন নাই হরিদাস।

—বলি, ব্যাপার কি দাদা! চোখ বুঁজে কি বৌদিকে ভাবছ।

হরিদাস সাহা হাসিলেন। হাসিলে তাহার কালো মুখটায় এক ধরণের শ্রী দেখা যায়। বলরাম তাঁহার গম্ভীর মূর্তিটা সহ্য করিতে পারেন না—হরিদাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে কী একটা অনিবার্য কার্য-কারণ-যোগে তাঁহার মনটাও যেন খচখচ করিয়া ওঠে। কেন বলা যায় না—মাঝে মাঝে বলরামের মনে হয় হরিদাস প্রেত-সিদ্ধ, ইচ্ছা করিলেই তাঁহার চোখের সামনে গোটাকয়েক ভূত নামাইয়া যা তা কাণ্ড করিতে পারেন।

—হুঁ, বৌদিকেই বটে।—হরিদাস বড় বড় চোখ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন: বিরহ-বেদনা আর কতকাল সহ্য করা যায়, বলো ?

—তা সত্যি। বলরামের কণ্ঠে সহানুভূতির আমেজ লাগিল: এমন করে কদিন আর কাটাবে ? আর শরীরের অবস্থা তোমার যা হয়েছে দাদা, তাতে সব সময়েই সেবা-শুশ্রূষা করবার একজন লোক দরকার। বুড়ো বয়েসে বউ কাছে না থাকলে—

—বটে ? বলরামের মনে হইল, হরিদাস যেন তাঁহার দিকে একরকম চোখ পাকাইয়াই চাহিলেন: হঠাৎ এ সব তত্ত্ববাক্য যে ! স্পষ্ট করেই বল তো কবিরাজ, দ্বিতীয় পক্ষের চেষ্টায় আছো নাকি ?

বলরাম অকারণে চমকিয়া উঠিলেন: যাও—যাও, দ্বিতীয় পক্ষ ! বয়স গেল পঞ্চাশ ছাড়িয়ে, এই বুড়ো বয়সে আর—

—কেন উলটো কথা বলছ ভায়া ? একটু আগেই না বলছিলে যে বুড়ো বয়সে বউ কাছে না থাকলে একেবারে অচল ? তা ছাড়া চেহারারও তো জৌলুষ ফিরেছে দেখছি। মাথায় তো দিব্যি একটি টাক পড়বার জো হয়েছে—ওদিকে গন্ধ-তেলটুকু মাখতে কসুর করো নি। যাই বলো আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে—

—সন্দেহ ? কী সন্দেহ ? বলরামের আগাগোড়া চেহারাটাই যেন গেল বদলাইয়া।

বলরাম জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না। তোমার কথাবার্তা সত্যি ভারী অভদ্র।

—অভদ্র ! কেন শুনি ? বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া কী একটা অনুমান করিয়া লইয়াই হরিদাস অতিশয় সশব্দে হাসিতে সুরু করিয়া দিলেন। অদ্ভুত অস্বাভাবিক হাসি, যেন কবিরাজের দুইটা কানের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া মগজের মধ্যে করাত চালাইতে

আরম্ভ করিল। বলরামের ইচ্ছা হইতে লাগিল, দু'হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান তিনি।

কিন্তু সমস্ত অবস্থাটাকে বাঁচাইয়া দিল কেরামদ্দি।

বাজার লইয়া সে ঘরে ঢুকিল, তারপর প্রশ্ন করিল, ভাতটা নামিয়েছিলেন বাবু ?

একবারটি হাসি থামাইয়া হরিদাস আবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন, ভাত ? সে অনেকক্ষণ পুড়ে ছাই হয়ে আছে।

—সে কি !

বাজারটা ফেলিয়া কেরামদ্দি ঘরে ঢুকিল। তারপর ভাতের হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না :

—ছি, ছি, এ যে একেবারে লাল হয়ে গেছে। আবার রাঁধতে হবে তো। আপনার কি কোনোদিকেই খেয়াল থাকে না বাবু ?

হরিদাস হাসিমুখেই বলিলেন, কী করে থাকবে ! কবিরাজ এল যে। যাক, তোমার ভাতের থেকে দুটি আমাকে দিয়ো কেরামদ্দি, এ বেলা তাতেই আমার চ'ল যাবে !

—আমার ভাত ? জাত যাবে যে বাবু !

—ইঃ, জাত যাবে ! জাত যাওয়া মুখের কথা কিনা। আমি তো আর বামুন নই যে আমার জাত কাঁচের মতো ঠুন্ করে ভেঙে পড়বে। এ ভারী শক্ত জিনিস—শাবল-গাঁইতি ছাড়া ভাঙবার নয়।

বলরাম হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, আমি এখন উঠলুম।

—উঠবে ? নিতান্তই উঠবে ! তা তুমিও তো একদিন নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করলে পারতে কবিরাজ। তোমার উনি ইদানিং কেমন রাঁধছেন টাঁধছেন তা—

—যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না—এবার কিন্তু

বলরাম জোর করিয়াও হাসিবার চেষ্টা করিলেন না। একখানা পাথরের মতো ভারী আর কালো মুখ লইয়া অত্যন্ত দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল, তিনি রাগ করিয়াছেন।

হরিদাস এক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর সামনের টেবিলটার উপর স্বচ্ছন্দে দুখানি পা তুলিয়া দিয়া শিস দিতে সুরু করিলেন। সত্যি সত্যিই যেন বলরামের কী হইয়াছে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে তাহাকে এতখানি পরিহাস-বিমুখ কখনো দেখেন নাই হরিদাস। তাসের আড্ডাটাও কদিন ধরিয়া বন্ধ হইয়া আছে।

—ওয়ান মণি-অর্ডার বাবু!

হরিদাস তাকাইয়া দেখিলেন, জানালার বাহিরে একজন বর্মি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখোচোখি হইতেই সে মার্বেল-বাঁধানো কঠিন মুখের ভিতরে একটুখানি হাসিল, ওয়েল, বাবু?

—হাঁ, ওয়েল। তোমরা কবে এলে?

—কাল। তোমাকে একটু কষ্ট দেব বাবু, মণি-অর্ডার আছে একটা।

—কত টাকার?

—ফিপ্‌টি। যাবে পিনাঙে। কবে পৌছুবে?

পোস্টমাস্টার চিন্তা করিয়া বলিলেন, নো ক্লিয়ার আইডিয়া। আট দশ দিন দেরী হতে পারে।

—আট দশ দিন! তা কী আর করা যাবে!

পোস্টমাস্টার মণি-অর্ডার রাখিয়া একটা রসিদ দিতে বর্মি অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল। গত পাঁচ বছর ধরিয়া ছয় মাস পর পর ইহারা এখানে ব্যাপার করিতে আসে। কিসের ব্যবসা যে করে তাহা তিনি ভালো করিয়া জানেন না—তবে ধান চাউলের কী একটা কারবার আছে

বলিয়াই তিনি শুনিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময় লাগে যে যাহাদের নিজের দেশ শস্যের অকৃপণ ঐশ্বর্য লইয়া বসিয়া আছে এবং বাংলা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষ যে দেশের মুখ চাহিয়া থাকে, সেই দেশ ছাড়িয়া ইহারা ভারতবর্ষে মরিতে আসে কী করিতে! এখানে আসিয়া ইহাদের এমন কী লাভটা হইবে! আর আসিলই যদি, তবে গোটা ভারতবর্ষের এত জায়গা ছাড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মুখের মধ্যে এই সৃষ্টিছাড়া চরে ব্যবসার এমন কোন্ সুবিধাটা হইতেছে! তা ছাড়া দাদন দিয়াই যখন এখান হইতে ধান-সুপারী কিনিতে হয়, তখন এখানে তো গাঁটের কড়িই খরচ করিবার কথা। কিন্তু ইহাদের ব্যাপারটা ঠিক উল্টা —ইহারা এখান হইতে পিনাং, মালয়, সাংহাইতে মণি-অর্ডারের পর মণি-অর্ডার করিতেছে!

চুলোয় যাক ও সব। আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খোঁজে দরকার নাই। পোস্টমাস্টার একটা হাই তুলিলেন।

কেরামদ্দি নতুন করিয়া কতকগুলি চাউল ধুইয়া আনিয়াছিল। বলিল, ভাত চাপিয়ে দিন বাবু!

—হয়েছে, হয়েছে—ভ্রূভঙ্গি করিয়া হরিদাস বলিলেন, এখন বসে বসে ভাত রাঁধতে আমার বয়ে গেছে। কেন দিক করছিস বাবা, যা হয় চারটি তুই-ই রেঁধে দে না।

—আমি রেঁধে দেব বাবু? কেরামদ্দি বিস্মিত হইয়া কহিল, আমার ছোঁয়া খাবেন আপনি?

—খাব না, কেন খাব না শুনি? আমার কালী পেত্নী বৌয়ের ছোঁয়াই যদি খেতে পেরেছি, তুমি আর কী দোষ করলে? ভয় নেই—আমি সমস্ত জাতের ওপরে, ওতে কোনো ক্ষতি হবে না।

কেরামদ্দি হাসিয়া চলিয়া গেল।

২

কালুপাড়ায় আসিয়া মণিমোহনের বোট ভিড়িল, তখন দিক্‌দিগন্ত ঘিরিয়া কালো সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। যেখানে আসিয়া নৌকাটা প্রথম লাগিল সে জায়গা হইতে গ্রাম ঠিক কাছে নয়। সম্মুখে অনেকটা জুড়িয়া বিস্তীর্ণ পঙ্কতট—জোয়ার আসিলে ঘোলা জলে ভরিয়া যায়। তারপর যখন কোনো সময় নদীর জলে বাতাসের দোলা লাগে তখন ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পা-ওয়ালা ছোট ছোট মিহু মাছ কাদার উপরে লাফাইতে থাকে।

এখান হইতে সামনে চাহিলে দেখা যায়: দূরের রিক্ত মাঠের উপর দিয়া যেন অন্ধকারের একটা বেড়াজাল কে ঘিরিয়া দিয়াছে। সারি সারি নারিকেল সুপারির মাঝখান দিয়া এক একটা আলোর রশ্মি আলেয়ার মতো দেখা যাইতেছে। ওইটাই গ্রাম।

বর্ষার সময় অবশ্য নৌকা লইয়া বড় নদীতেই বসিয়া থাকিতে হয় না। বাঁ দিকে একটু দূরে যে ছোট খালটি শুকাইয়া একটা খাদের মতো পড়িয়া আছে, ওইটা তখন অজস্র জলে টই-টম্বুর হইয়া যায়। শুধু ডিঙি নৌকা কেন—সরকারের এত বড় বোটখানাকেও তখন একেবারে গ্রামের বুক পর্যন্ত লইয়া যাওয়া চলে।

সন্ধ্যায় আর কোনো কাজ হইবে না, অতএব চুপচাপ বোটে বসিয়াই কাটাইতে হইবে রাতটা। মাঝিরা ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত চাপাইয়া দিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে মশটার উপরে বাজিয়া গেল এবং সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত মাঝির দল যে-যেখানে পারিল পড়িয়া রহিল লম্বা হইয়া। কেবল সারাটা নির্জন রাত্রি ধরিয়া তেঁতুলিয়ার

জল অশ্রান্তভাবে বোটটার চারি পাশে খেলা করিতে লাগিল—সম্মুখে পশ্চাতে অপর্যাপ্ত সোনার উপর ফস্‌ফরাস্ চিক্ চিক্ করিতে লাগিল এবং হুহু করা বাতাসে দ্বিপ্রহর অবধি মণিমোহনের ঘুম আসিল না। নিম্নবাংলার রাক্ষসী নদীটা এই রাত্রে কেমন করিয়া যেন মায়াময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

সকাল বেলা পঙ্কতীর পার হইয়া সামনের মাঠের মধ্যে মণিমোহন ছোট খাটো একটা কাছারী করিয়া বসিল। দেশটা প্রায় আগাগোড়া জেলে আর মুসলমানের—তবে মগও কিছু কিছু আছে। তাহারা এখানে ব্যবসা করে। বর্মা চুরুটের জন্ত সুপারির বাল্‌দোর কী দরকার আছে কে জানে, সেগুলি নাকি এখান হইতে সংগ্রহ করে তাহারা।

পেয়াদা গিয়া প্রজাদের খবর দিয়া ডাকিয়া আনিল। দুর্বৎসরে গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহাদের টাকা দেওয়া হইয়াছে। এখন সেই টাকাটা আদায়ের সময়।

এই দূর দুর্গম দেশে প্রজারা অফিস-আদালত এবং সহরের আরো দশটা উপসর্গের চৌহদ্দি হইতে পুরাপুরি বাহিরেই আছে। এক ফৌজদারী জাতীয় আইন-ঘটিত বিশৃঙ্খলাই ইহাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে এবং তাহার মীমাংসা এরা নিজেরাই করিয়া লয়। সুতরাং সরকার-সম্পর্কিত একটা ক্ষুদ্র পেয়াদাও এখানে আসিয়া দর্শন দিলে ইহারা তাহাকে অতিরিক্ত সমীহ করিয়া থাকে। সেই কারণে সরকারী তহশীলদারের আবির্ভাব ইহাদের একটা বিরাট স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথমে যে লোকটা আসিল, তাহার বয়স হইয়াছে। অস্বাভাবিক বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সের স্পর্শে বাঁধুনি ঢিলা হইয়া পড়ে নাই। একমুখ পাকা দাড়ী মেহেদী দিয়া রাঙানো হইয়াছে, কিন্তু বার্ধক্যের পাশাপাশি এই অনুরাগটুকু যেন মানায় নাই। পরণের লুঙ্গিটার রঙ

সাদাই ছিল—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ময়লার একটা পুরু আবরণ পড়ায় এখন তাহার জাতিগোত্র নির্ণয় করিবার জো নাই।

একহাতে এক জোড়া মুরগী ঝুলাইয়া আনিয়াছিল। আসিয়াই সে একটা সশ্রদ্ধ সেলাম জানাইল, বলিল, হুজুরের শরীর ভালো আছে তো?

যেন কতকালের চেনা। মণিমোহন হাসিয়া বলিল, হাঁ ভালোই আছে। কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলুম না।

—চিনতে পারবেন কেমন করে? আর কখনো এ তল্লাটে আসেন নি তো। আগে যিনি এই 'সায়খেলে' ছিলেন তিনি আমায় ভালো করে চিনতেন। বান্দার নাম মজাঃফর মিঞা।

—ও, মজাঃফর মিঞা। কত টাকার লোন তোমার?

—আজ্ঞে সে সামান্যই—হুজুরের চোখে পড়বার মতো নয়।

মজাঃফর মিঞা বিনয়ে জিভ্ কাটিল। তারপর মুরগী জোড়া মণিমোহনের পায়ের কাছে রাখিয়া বিনয়-গলিত স্বরে বলিল, হুজুর যদি কিছু মনে না করেন—

কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মণিমোহন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

—গোপীনাথ!

গোপীনাথ খাতা খুলিয়া বসিয়াই ছিল, আজ্ঞে?

—দেখ তো মজাঃফর মিঞার কাছে কত টাকা পাওয়া যাবে?

মজাঃফর বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ্ঞে সে কটা সামান্য টাকার জন্যে সরকার বাহাদুরের আর—

কর্তব্য পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন গোপীনাথ। ধমক দিয়া কহিল, বেশি কথা কোয়ো না বড় মিঞা। দেখছ তো স্বয়ং হুজুর সামনে বসে আছেন। বলো, তোমার বাপের নাম কী?

—বাপের নাম, বাপের নাম?

অধৈর্য স্বরে গোপীনাথ বলিল, হাঁ হাঁ বাপের নাম। ওকি মাথা চুলকোচ্ছ হে—বলি, সেটা কি ভুলে গেছ নাকি?

মজাঃফর মিঞা মেহেদী রাঙানো দাড়ির ভিতর দিয়া বিনীত মৃদু হাস্য করিল। লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, আজ্ঞে ভুলে যাওয়াটা তো তাজ্জব নয়। আমার বয়েস যদি তিন কুড়ি সাত বছর হয়, তবে তিনি কতকাল আগে বেহেস্তে গেছেন ভেবে দেখুন দেখি?

মণিমোহন অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিল।

গোপীনাথ তখন আঙুলে থুথু লাগাইয়া খস্ খস্ করিয়া একখানা মোটা খাতার পাতা উল্টাইতেছিল। মৌজে রঘুনাথপুর, মৌজে ভ্যাব্লাহাট, মৌজে কালুপাড়া, কালুপাড়া—

—চালাকি পেয়েছ নাকি? এ জমিদারী সেরেস্তার তহশীলদার নয়—একেবারে সাক্ষাৎ হাকিম। বেশি ওস্তাদি করো তো সদরে যেতে হবে, খেয়াল থাকে যেন। বলো শিগগির, বাপের নাম কী?

মজাঃফর মিঞা যেন মুষড়াইয়া গেল। সদর নামটা এমন প্রবীণ জোয়ান লোকটার মনের উপরেও অদ্ভুতভাবে ক্রিয়া করিয়াছে। কাতর কণ্ঠের উত্তর আসিল, আস্রফ মিঞা।

—হুঁ। এই তো কথা ফুটেছে দেখছি। মণিরুদ্দিন মিঞা, করম গাজী—হাঁ, এই যে মজাঃফর মিঞা। সাং গোবালিয়া, মৌজে কালুপাড়া—পিং মৃত আস্রাফ আলী হাওলাদার—ওরে বাপ্‌রে ৫২॥৶৫ পয়সা!

গোপীনাথ মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবু মুরগী দেওয়ার ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলেন তো?

মণিমোহন হাসিয়া কহিল, সেটা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলুম।

দু'টি একটি করিয়া চারিপাশে তখন অনেক কয়টি প্রজা আসিয়া

ভিড় করিয়াছে। খাসমহাল কাছারীর তহশীলদারের এই আকস্মিক আবির্ভাবে তাদের মন যে আনন্দে উছলাইয়া ওঠে নাই, সেটা তাদের অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান করিয়া লওয়া চলে। তবু একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল—মজাঃফর মিঞার দুর্গতিতে তাহারা অনেকেই খুশি হইয়া উঠিয়াছে।

গোপীনাথ মুখের উপর একটা ভীতিদায়ক গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া বলে, হুঁ ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। হাসি বেরিয়ে যাচ্ছে সব—দাঁড়াও। তারপর বড় মিঞা, টাকার কী হবে?

বড় মিঞা ম্লান হইয়া বলিল, কী হবে তা তো আমিও ভাবছি। সব সুপুরী বাদুড়ে নষ্ট করে দিলে, ধানও এমন পাই নি যে—

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া উঠিল: কেন মিথ্যে কথা বলে এই বুড়ো বয়েসে পাপের বোঝা বাড়াচ্ছ বল তো? বাদুড়ে আর কটা সুপুরী খেয়ে নষ্ট করতে পারে। তা ছাড়া সবাই-ই তো বলছে, এবারের মতো ধান গত পাঁচ বছরেও হয় নি।

মজাঃফর কহিল, নসীব হুজুর, নসীব। যার বরাত ভালো সে পেয়েছে। কিন্তু আমি—ক্ষোভে বড় মিঞার মেহেদী রঙীন্ দাড়িটি যেন কাতর হইয়া গালের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

মণিমোহন কহিল, আচ্ছা বেশ, সব না পারো, অর্ধেক দাও। তোমরা টাকা না দিলে আমার চাকরী কী করে থাকবে। তিরিশটা টাকা ফেলে দাও, তা হলেই—

—তিরিশ টাকা! বড় মিঞার চোখ দুইটা প্রায় কপালে উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

গোপীনাথ মুখ বিকৃত করিয়া কী একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই ভীড়ের মধ্যে হইতে আর একজন কথা কহিয়া উঠিল।

—তা এমন শক্তটা কী! এই পরশুই তো একজোড়া মোষ আশী টাকায় বিক্রী করেছ চাচা, তা থেকেই টাকা কটা ফেলে দাও না!

বিনা মেঘে কোথা হইতে বজ্রাঘাত হইয়া গেল যেন।

হাকিমের সামনে এতক্ষণ বিনয়াবনত হইয়া থাকিলেও এইবারে মজাঃফর মিঞার আর ধৈর্য রহিল না। —কে, কাশেম খাঁর ব্যাটা বুঝি? বেশ করেছি, বিক্রী করেছি আশী টাকায়, তোকে এখানে মোড়লী করতে কে ডেকেছে?

—কেউ ডাকে নি—হুজুরকে কেবল খবরটা দিয়ে দিলুম। অত্যন্ত নিরীহ স্বরে কাশেম খাঁর ব্যাটা জবাব দিল। কিছুদিন আগেও গায়ের জোরে গোরু নামাইয়া মজাঃফর মিঞা তাহার ক্ষেতের ধান খাওয়াইয়াছে, সে কথা সে ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যায় নাই।

—ইঃ, মস্ত খবর দেনে-ওয়ালা এসেছে রে! মজাঃফর মিঞা বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, ও ব্যাটাচ্ছেলের কথা বিশ্বাস করবেন না। শত্রুতা আছে বলে আমার নামে যা নয় তাই লাগাচ্ছে।

—আচ্ছা সে আমি দেখছি। ও মিথ্যে বলছে কিনা তার বিচার পরে করব। কিন্তু অন্তত তিরিশটা টাকা না দিলে তো—

কথাটার মাঝখানেই বড় মিঞা সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত জোড় করিল। গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া কিছু একটা বলিবার উপক্রম করিতেই একটা বিশৃঙ্খল উগ্র কোলাহল আসিয়া সমস্তটারই সুর কাটিয়া দিল।

সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা বিক্ষুব্ধ জনতা। সর্বাগ্রে আধাবয়সী একজন মগ, তাহার কপালে প্রকাণ্ড একটা ক্ষত হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত নামিয়া আসিতেছে। গালের দুটি পাশ দিয়া, গলার খাঁজ বাহিয়া

বাহিয়া ময়লা ফতুয়াটার উপর ফোঁটায় ফোঁটায় থক্‌থকে গাঢ় রক্ত টপ্‌টপ্‌ করিয়া পড়িতেছে। নোংরা বুনো চেহারা, গালে মুখে পাতলা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রক্ত মাখিয়া মা দুর্গার মহিষাসুরের মতো দেখাইতেছে।

গোপীনাথ বলিল, কী সর্বনাশ!

মণিমোহন চমকিয়া বলিল, কী হয়েছে? এমন করে কে মারলে!

লোকটা কোনো জবাব দিল না, দুর্বোধ্য ভাষায় কেবল বিড়বিড় করিয়া কী বকিল খানিকটা। সঙ্গে যে সমস্ত মুসলমান আসিয়াছিল, সমবেত চীৎকারে তাহারা জানাইয়া দিল, মেরেছে হুজুর, মেরেছে।

—মেরেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কে মারলে?

অপরাধী দূরে ছিল না—জনতার সঙ্গেই সে আসিয়াছিল। অথবা জোর করিয়াই আনা হইয়াছিল তাহাকে। মণিমোহন প্রশ্ন করিবামাত্র তিন চারজন লোক তাহাকে হিড় হিড় করিয়া সামনে টানিয়া আনিল। সে তো প্রাণপণে গালাগালি করিতে লাগিলই, তা ছাড়া যাহাকে সুবিধা পাইল, সাধ্যমত আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিতে ত্রুটি করিল না।

সেদিকে চাহিতেই মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া গেল।

যেন চারিদিকের এই অমার্জিত, অন্ধকারের রাজ্যে এক খণ্ড অঙ্গার কোথা হইতে ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আঠারো উনিশ বছর বয়সের একটি মগের মেয়ে। সুশ্রী ছিপছিপে দেহ, গায়ের রঙ্‌টি এই নোনার দেশে আসিয়াও মলিন হইয়া যায় নাই। যৌবনশ্রী যেন তাহার পূর্ণায়ত দেহ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—সেদিক তাকাইলেও নেশা ধরিয়া যায়। তাহার দুইটি নীল চোখ প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিতেছে—যেন দুই খণ্ড হীরার মধ্য হইতে বিষের একটা নীলাভ দ্যুতি ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

বোকার মতো শুধু প্রশ্ন করিতে পারিল : কে কে?

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন আহত লোকটিকে দেখাইয়া বলিল, এর স্ত্রী।

—এর স্ত্রী! এমন রাজকন্যার স্বামী হইয়া বসিয়াছে ভালুকের মতো এই কদাকার লোকটা! আত্ম-সংবরণ করিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল : কিন্তু স্বামীকে এমন করে মারলে কেন?

মগের মেয়েটি এতক্ষণ পরে মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, কিন্তু সরল। মেয়েদের চোখের দৃষ্টিতে কেবল যে বাঁকা বিদ্যুৎই ঝলকিয়া যায় না—এই দৃষ্টিটা দেখিয়া সেকথাই মণিমোহনের মনে পড়িল। এ তরবারির মতো সোজা এবং শাণিত, কেবল দেখিতে চায় না, বিঁধিয়া ফেলিতে চায়।

সহজ কণ্ঠে, স্পষ্ট প্রাদেশিক বাংলায় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সদরের সরকারী লোক?

—হাঁ।

—তা হলে তোমার কাছেই বিচার চাই।

—বিচার! মণিমোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, বেশ তো বলো।

মেয়েটি কথা না বলিয়া চারিদিকের জনতার দিকে একবার তাকাইল। মণিমোহন তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। মজাঃফর মিঞাকে ডাকিয়া সে বলিল, বড় মিঞা, এখান থেকে সব ভিড় সরাও—পরে তোমাদের ব্যাপার বুঝবো।

কৌতূহলী জনতার মধ্যে অসন্তোষের একটা গুঞ্জন উঠিল। অনেক আশা করিয়া তাহারা আসিয়াছে, এত সহজেই তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে! তা ছাড়া মেয়েটা যখন গোপনে আরজী করিতে চাহিতেছে, তখন গুরুতর ব্যাপার একটা কিছু আছেই।

গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া বলিল, যাও—এখান থেকে যাও সব।

অতএব যাইতেই হইল। সরকারী কর্মচারী তো নয় সাক্ষাৎ হাকিম। ইচ্ছা করিলে যখন তখন সদর ঘুরাইয়া আনিতে পারে। তাহারা দূরে দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু একেবারে চলিয়া গেল না।

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া কহিল, কী তোমার নালিশ?

আহত লোকটা কথার মাঝখানে একবার হাউমাউ করিয়া উঠিল—যেন কী একটা কথা তাহার বলিবার আছে। কিন্তু একটা বজ্র ধমকেই মেয়েটি তাহাকে দিল থামাইয়া।

—নালিশ? নালিশ অনেক আছে। ও আমার স্বামী বটে, কিন্তু দিনরাত মদ খায়। আমাকে যখন তখন মারে। কী একটা মেয়েমানুষ আছে, তার ওখানে রাত কাটিয়ে আসে। তুমি সরকারী লোক এসেছ বাবু, তুমিই এর বিচার করো। আজ তো কেবল ইঁট মেরেছি, এতে যদি শায়েস্তা না হয় তো একদিন দা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব—এই বলে রাখছি।

মেয়েটির কথার তোড়ে যেন ঝড় বহিয়া গেল।

গোপীনাথ শিহরিয়া বলিল, বাপ্‌স্, সাক্ষাৎ জাত-গোখরোর বাচ্ছা!

রসিকতাটা মেয়েটি বুঝিতে পারিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার চোখ দুইটি তেমনি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

—করবে তো বাবু বিচার?

—করব বই কি। মণিমোহন একবার কাশিয়া ফরিয়াদী এবং আসামী স্বামীটির দিকে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, এ যা বলছে, তা কি সত্যি?

ধমক খাইয়া লোকটা সেই যে চুপটি মারিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার

মুখ খুলিল। আউ আউ করিয়া ভাঙা বাংলায় সে বলিল, না—না হুজুর, এ যা বলছে সব—

মেয়েটি আকস্মিকভাবে আবার গর্জিয়া উঠিল। বেচারী স্বামী যে ধমক খাইয়া শুধু থামিয়াই গেল তা নয়, ধপ করিয়া একেবারে মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল। করুণা হয় লোকটার অবস্থা দেখিলে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' মনে পড়িল, যেখানে মেয়েরা পুরুষকে ধরিয়া সদর রাস্তায় ঠ্যাঙাইতেছে। এ তো তাহাদেরই স্বজাতি!

—আবার মিথ্যে কথা বলছ! চুপ করে থাকো, একেবারে চুপ।

একেবারে চুপ করিয়াই সে রহিল। কপালের ক্ষতটা তাহার এমন বেশি নয়, সাধারণভাবে একটু চামড়া কাটিয়া গেছে মাত্র। হয়তো পাঁচ সাত দিন পরে আপনিই শুকাইয়া ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু আপাতত এই মুহূর্তে সে যে স্ত্রীর ভয়েই বেশি কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়া সেটা বুঝিয়া নেওয়া কঠিন ছিল না।

তাহার হইয়া জবাব মেয়েটিই দিল। বলিল, ও আর কী বলবে বাবু, ওর বলবার কী আছে। আজ ওকে ইঁট মেরেছি, বাড়াবাড়ি করলে দা বসাব, সেইটেই বুঝিয়ে দিন।

মণিমোহন হাসিল।

—দা বসাবে? দা বসালে ফাঁসি হবে, জানো?

—ইঃ, ফাঁসি! মেয়েটির ভ্রূভঙ্গী যেন অদ্ভুত একটা রূপের ছটা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিল। দেখিয়া মনে হইল বাস্তবিকই ইহাকে ফাঁসি দিবার মতো দড়ি আজো সৃষ্টি হয় নাই।

মণিমোহন স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যাও, কখনো আর এমন কোরো না। স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে মার খেতে হবে, এ তো জানাই আছে।

স্বামীটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাথা নাড়িল। যেন পরম ব্রহ্ম সম্পর্কিত একটা দার্শনিক তত্ত্ব এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

মেয়েটি এইবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আরক্ত ক্ষুদ্র দুইটি ঠোঁটের ভিতর হইতে উজ্জ্বল কয়েকটি তীক্ষ্ণদাঁত বাহির হইয়া আসিল। দেখিতে মনোরম, কিন্তু তাহার সহিত শ্বাপদের দাঁতের কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে হয়তো।

—আর তুমিও কখনো এমন করে মেরো না। হাজার হোক, স্বামী তো। লোকে কী বলবে ?

—নিজের দোষে মার খেলে আমি কী করব ? মেয়েটির মুখে হাসি-টুকু আল্‌গাভাবে লাগিয়াই রহিল : তুমি বড় ভালোমানুষ সরকারী বাবু, ঠিক বিচার করতে জানো। কিন্তু গাঁয়ের লোকেই কেবল বুঝতে চায় না।

তাহার নীল চোখদুটি এতক্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বিষাক্ত হীরা নয়—যেন দুই খণ্ড নীলকান্ত মণি। সেই চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে মণিমোহনের দিকে তাকাইল।

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তোদের দেশ কোথায় ?

—বর্মা দেশ, মৌলমিন।

—এখানে কী করো ?

মেয়েটির ভ্রূভঙ্গিতে বিরক্তি প্রকাশ পাইল।

—এখানে থাকি আর কী করব। জমি আছে, খামার আছে। —তারপর মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, গাঁয়ের ভেতর যদি যাও তবে আমার ওখানে একবার যেয়ো না বাবু। আমার নাম মা-ফুন।

আহত লোকটার রক্তাক্ত মুখখানা মণিমোহনকে পীড়িত করিতেছিল। সে বলিল, আচ্ছা যাব। কিন্তু তার আগে তোমার স্বামীর মাথাটা ভালো

করে শুইয়ে দাও। যে ইঁট মেরেছ, বেচারা প্রাণে বেঁচে আছে এ ওর জোর কপাল।

—ইঃ, মরবে! ওর মরা এত সস্তা কিনা! মরলে আমাকে এমন করে কে জ্বালাবে? আচ্ছা, চললুম বাবু।

অভিবাদন জানাইয়া আর একবার সহাস্য কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় স্বামীকে টানিয়াই লইয়া গেল একরকম। কসাইখানার পথে মৃত্যুভীত পশুকে যেমন হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ভাবটা সেই জাতীয়।

গোপীনাথ জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দেখলেন হুজুর, কী চীজ্ একখানা! সাক্ষাৎ মগের মেয়ে তো। বাঘিনীর চাইতে কম নয়।

অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ সামনে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল মণিমোহন। তারপর বড়ো করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁঃ ডাকো ওদের। বসে থাকলে তো চলবে না, আদায়ের বন্দোবস্ত যাহোক একটা করতে হবেই।

৩

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

কিন্তু বিলের বুকে দু'টি চারটি বুনো-কল্‌মি ফুল ছাড়া সে বসন্তকে বুঝিবার জো নাই। অবশ্য মানুষের মনের কথা আলাদা। প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত জীব-জগতেই যখন বসন্তের চেতনা প্রসারিত হইয়া পড়ে—তখন এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নয়। স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে তাহার রূপ ও রঙ বদলায় মাত্র।

বসন্তের বাতাসে যে চিরন্তন ক্ষুধাটা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কোনো আকার নাই। ক্ষুধা হিসাবে সে সর্বজনীন, কিন্তু কোন্ পটভূমিতে সে যে কী রূপান্তর লইবে সেটা কেউ বলিতে পারে না। মঞ্জরিত বনস্থলীতে কস্তুরী-মৃগের গন্ধে তাহার যে ছায়াছবি রূপ পাইয়া ওঠে, অথবা নাগরিক জগতের আলো-ঝলসিত রাজপথে চকিত কটাক্ষের মধ্য দিয়া যে ভাবে সে ধরা দেয়—এখানে সে ভাবে তাকে খুঁজিয়া পাইবার জো নাই।

এখানকার বসন্ত আসে ঝড়ের সংকেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাঁট ফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কাল বৈশাখীর তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মতো ফাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চল-কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে।

পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলার বাহিরে এই চর ইস্‌মাইল।

তাই এখানকার মাটিতে কখনো সোনার ফসল দেখা যায় না; সৃষ্টির

বীজ এখানকার গর্ভকোষের সংস্রব আসিয়া অনাস্বৃষ্টিতে পল্লবিত হইয়া ওঠে।

জোহান ভয় পাইয়াছিল যেমন, উত্তেজিত হইয়াছিল তেমনই। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি যে কে ছুঁড়িয়াছে, সে-সম্বন্ধে সে একটা মোটামুটি আন্দাজ যে না করিয়াছিল তা নয়। রাগটা তাহার নানা কারণে বেশি হইয়াছিল ডি-সুজার উপরেই। ডি-সুজা যা ভাবিয়াছে তাহার চাইতে সে-যে অনেক বেশি বিপজ্জনক, সে-কথাটা বুঝাইয়া দিবার সময় হইয়াছে।

সুযোগ করিয়া একদিন লিসিকে লইয়া সে ভাসিয়া পড়িবে চিদাম্বরমে। তাহার এক খুড়া সেখানে মাদ্রাজ সাউথ্ মারাঠা রেলোয়েতে ড্রাইভারী করে, সে সেখানে যা হোক একটা কিছু চাকরী-বাকরী জুটাইয়া দিবেই।

জোহান আসিয়া যখন লিসির দেখা পাইল, লিসি তখন একরাশ পেঁয়াজ লইয়া ছাড়াইতে বসিয়াছে। ডি-সুজা বাড়ীতে নাই, সম্ভবত সহরে গিয়াছে। অথবা কোথায় গিয়াছে জোহানের পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

জোহানের মুখের দিকে বাঁকা কটাক্ষ করিয়া লিসি বলিল, আবার এলে যে!

লিসির পাশে একটা ভাঙা টুলের উপরে জোহান বসিয়া পড়িল ধপ্ করিয়া। কাতরোক্তি করিয়া কহিল, নাঃ, আর পারা যায় না!

বিরল ভ্রূ-রেখাটাকে লিসি বাঁকাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, কেন, কী হয়েছে?

—হয়েছে অনেক কিছুই। চলো, এখানে আর নয়। আমরা পালাই।

লিসি সত্যি সত্যিই চমকিয়া উঠিল, পালাব! কী বলছ জোহান? কোথায় পালাব?

জোহানের কণ্ঠস্বরে মরিয়া ভাব প্রকাশ পাইল: চিদাম্বরম্—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী। আমার এক কাকা আছে এম্-এস্-এম্-এর ড্রাইভার। সেই চাকুরী জুটিয়ে দেবে। তা ছাড়া গোয়াতেও যেতে পারি, সেখানেও—

—ক্ষেপেছ তুমি?

মুহূর্তের জন্য লিসিকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মনে হইল। সে জোহানের মুখের অত্যন্ত কাছে মুখটা আনিয়া কী একটা ঘ্রাণ লইবার চেষ্টা করিল। ভোঁতা ছোট নাকটিকে বার কয়েক সুন্দর ভাবে কুঁচকাইয়া স্পষ্ট ভাবে প্রশ্ন করিল, কী ব্যাপার? আজ বুঝি আবার খানিকটা তাড়ি গিলে এসেছ?

—না লিসি, তাড়ি খাই নি। সত্যি বলছি—

একটা ঝটকা মারিয়া লিসি তিন পা সরিয়া গেল। আধখানা কাঁচা পেঁয়াজ কচমচ করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কুঞ্চিত মুখে মন্তব্য করিল, সত্যি তো তুমি চিরকালই বলে আসছ! তাড়ি খেলেই তোমার মুখ দিয়ে ভালো ভালো গস্‌পেল বেরোতে থাকে। যাও যাও, বোকো না এখন। আমার বিস্তর কাজ রয়েছে।

জোহান বিব্রত হইয়া বলিল, তাড়ি একটু খেয়েছি বটে, কিন্তু মেরীর নাম করে বলছি লিসি, আমার একটুকু নেশা হয় নি। বড্ড দরকারী একটা কথার জন্যে তোমার কাছে এসেছি, রাগ কেরো না।

লিসির অবিশ্বাস গেল না, তবু একটু কাছে আগাইয়া আসিল সে। বলিল, হুঁ। তা দরকারী কথাটা কী, শুনি?

জোহান গলাটা নামাইয়া আনিল, বলিল, কাল বিলে হাঁস মারতে গিয়েছিলুম। জলে নেমেছি, এমন সময় দূরের থেকে দুম্ দুম্ করে কে দুটো গুলি ছুঁড়লে। একটা তো কানের ওপর দিয়ে গেছে। বেঁচে গেছি কেবল মেরীর দয়ায়।

লিসির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—কে গুলি ছুঁড়লে দেখতে পাও নি ?

—কী করে পাবো! প্রাণের ভয়ে আধ ঘণ্টা তো বিলের কাদার ভিতরেই ডুবে ছিলুম। উঠে আর কারো পাত্তা পাই নি।

শঙ্কিত মুখে ত্রস্ত গলায় লিসি বলিল, এ নিশ্চয় ও ব্যাটার কাজ। ও তোমাকে সন্দেহ করেছে। ভালো চাও তো আজই এখান থেকে পালাও জোহান।

—পালাবই তো। আর সে জন্যে তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।

—কিন্তু আমি! আমি কী করে যাব!

জোহান মিনতি করিয়া কহিল, তুমি না গেলে কী করে চলবে লিসি! তোমার আশাতেই কোনো রকমে বেঁচে আছি। চলো, আজ রাত্রেই নৌকো করে—

—জোহান!

দুই জনেই চমকিয়া উঠিল। চোখ পড়িতেই দেখিল দরজার কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ডি-সুজা। রাগে তাহার চোখ দুটি বাঘের মতো দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ডি-সুজা বলিল, নিষেধ করে দিয়েছি, তবু আমার বাড়ীতে তুমি কেন এসেছ! বেল্লিক, উল্লুক, ভল্লুক, শয়তান কোথাকার!

জোহান গরম হইয়া কহিল, গালাগালি কোরো না ঠাকুর্দা!

ডি-সুজা ভ্যাংচাইয়া কহিল, না, গালাগালি করবে না, আদর করে' চুমু খাবে! যাও, বেরোও আমার বাড়ী থেকে, হতভাগা, পাজী, শুয়োর, গাধা—

জোহানের মাথার মধ্যে পর্তুগীজ রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠিল। দুই পা সাম্‌নে আসিয়া সে বলিল, আবার গালাগালি করছ ঠাকুর্দা!

—গালাগালি! খুন করে ফেলব তোকে। ব্যাটা— বাপ মা সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া ডি-সুজা অত্যন্ত কদর্যভাবে একটা গালি-বর্ষণ করিল।

জোহানের চোখের তারায় একটা হিংসার আলো চিক্‌মিক্ করিতে লাগিল।

—বেশি কথা কোয়ো না ঠাকুর্দা। জানো তুমি, ইচ্ছে করলে তোমাকে এখুনি দশ বছরের মতো ঘানি টানিয়ে আনতে পারি?

—কী, কী বল্‌লি! ভয় এবং ক্রোধে ডি-সুজার সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল: কী বল্‌লি তুই!

—যা বলছি তা সোজা কথা। হাঁ, পুরো দশ বছর। এর কমে যদি মেয়াদ হয় তো আমার নাম বদলে রেখো।

লিসি চমকিয়া বলিল, জোহান!

কিন্তু জোহানকে শয়তানে পাইয়াছিল। ডি-সুজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে একটা ভয়ংকর সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা দেখিয়াও সে এতটুকু ভয় পাইল না। কহিল, বলব না, বলবই তো। চোরাই আফিঙের ব্যবসা করে লাল হয়ে উঠেছ ঠাকুর্দা—

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল ডি-সুজা। আরাকানী রক্ত-মিশ্রিত তাহার তামাটে মুখ যেন একখণ্ড শাদা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। এতক্ষণ ধরিয়া যেটা দ্বিধার মতো চোখের

সামনে ভাসিতেছিল, সেটা আর দ্বিধা নাই; রহস্যের পাতলা স্বচ্ছ আবরণটা সরিয়া গিয়া বহু আশঙ্কার সেই নিদারুণ সত্যটাই প্রকাশ পাইয়া বসিয়াছে।

লিসি আবার বলিতে চাহিল, জোহান! কিন্তু ভয় আসিয়া তাহার গলায় এমনি জাঁতিয়া বসিয়াছে যে অস্ফুট একটা আর্তনাদ ছাড়া আর কথা বাহির হইল না।

ডি-সুজার চোখের সামনে দপ্ করিয়া সর্বপ্রথম বর্মিটার মুখখানা আসিয়াই দেখা দিল। অন্ধকার পর্দার উপরে যেমন ভাবে ছবি ফুটিয়া ওঠে—তেম্‌নি করিয়াই তাহার সেই বিকারহীন পাথুরে মুখখানা তাহার মনের সম্মুখে উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদে চোখ দুইটা দিয়া একটি মাত্র ইঙ্গিতই বাহির হইতেছিল এবং সে ইঙ্গিত—

ফস্ করিয়া ডি-সুজা পা-জামার মধ্যে হাত পুরিয়া দিল এবং পরক্ষণেই হাতে করিয়া যা বাহির করিয়া আনিল, সে দিকে চাহিয়া জোহানের চোখ টোম্যাটোর মতো বড় বড় হইয়া উঠিল।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারটা তখন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কাঁপিতেছে।

জোহান রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, পিস্তল!

—হাঁ, পিস্তল। তোকে খুন করব আমি! ডি-সুজার কম্পিত তর্জনীটা কাঁপিতে কাঁপিতে ট্রিগারটাকে খুঁজিতে লাগিল।

চট্ করিয়া যেন চমক ভাঙিয়া গেল লিসির। বাঘের মতো একটা থাবা দিয়া সে ডি-সুজার হাত হইতে অস্ত্রটা ছিনাইয়া লইল। বলিল, ঠাকুর্দা, করছ কী! সত্যিই কি তুমি খুন করতে যাচ্ছ নাকি!

অস্ত্রটা লিসির হাতে নিরাপদ জায়গায় গিয়া পৌছিয়াছে দেখিয়া বীরদর্পে সামনে অগ্রসর হইয়া আসিল জোহান। তারপর চোখের

পলক না ফেলিতে সে ধাঁ করিয়া প্রকাণ্ড একটা ঘুঁষি বসাইয়া দিল ডি-স্থজার মুখে।

—খুন করবে! খুন করা এতই সস্তা!

ঘুঁষি খাইয়া তিন পা পিছাইয়া গেল ডি-স্থজা। তারপর আঘাতটাকে সহ্য করিয়া যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন জোহান অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কিন্তু ডি-স্থজার দিকে চাহিয়া লিসির আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

—ঠাকুর্দা! ঠাকুর্দা!

ঠাকুর্দার নাক দিয়া তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া তাজা রক্ত ঝরিতেছিল। তাহার শাদা গোঁফ জোড়াকে ভিজাইয়া সে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়িতেছিল।

লিসি কহিল, তোমাকে মারলে ও! তাহার মঙ্গোলীয়ান মুখখানা ঘিরিয়া বন্য ব্যাঘ্রীর হিংস্রতা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ডি-স্থজা কী একটা বলার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দুই হাতে রক্তাক্ত নাকটা চাপিয়া ধরিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

সপ্তাহে একটি দিন চর ইস্‌মাইলে খুব বড় করিয়া হাট বসে।

চরের উত্তরে যেখানে তিনটি সরু খাল আঁকাবাঁকা বিসর্পিল রেখায় তিনদিক হইতে ঢুকিয়া এক জায়গায় আসিয়া একত্রে মিলিয়াছে এবং প্রচুর পলিমাটি ও বালি জমিয়া একটা উঁচু ডাঙার সৃষ্টি করিয়াছে, সেইখানেই গ্রামের হাট।

সব জায়গাতেই গ্রামের হাটখোলায় একটি না একটি বারোয়ারী দেবতার স্থান দেখা যায়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হাটের

মাঝখানে বড় গাজী কায়েমী হইয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুক্রবার দিন তাঁহার 'শিন্নী' হয়। গাজী, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বন-বিবি, এই চারটি দেবতা বা অর্ধ দেবতা মিলিয়া আজও অপ্রতিহত প্রতাপে নিম্ন-বঙ্গ শাসন করিতেছেন; শিব, কালী, পীর সকলকে ছাড়াইয়াই ইঁহাদের সম্মান।

গাজীতলার চারপাশ ঘিরিয়া হাট বসিয়াছে। ছোট ছোট খালগুলি ডিঙি নৌকায় বোঝাই। যে সমস্ত বড় নৌকা খাল দিয়া আসিতে পারে না, ছোট ডিঙি নামাইয়া দিয়া তাহারা হাট করিতে আসিতেছে।

রাধানাথকে সঙ্গে করিয়া বলরাম হাটে আসিলেন।

কাজটা বলরামের নয়। তিনি সৌখীন মানুষ, এ সব ঝক্কি পোয়ানো তাঁহার স্বভাবের বাহিরে। তবু আজ নিজেই আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাধানাথ ইহাতে খুশি হয় নাই, লাভের মধ্যে তাহার সাপ্তাহিক বরাদ্দটাই মারা পড়িল।

কাছাকাছি কোথাও তাঁতিদের গ্রাম আছে একটা। প্রত্যেক হাটবারে তাহারা নানারকমের শাড়ী-গামছা এই সব বিক্রী করিতে আনে। বলরাম সেগুলি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

রাধানাথ বলিল, বাবু, মাছটা আগে না কিনলে—

—হবে এখন দাঁড়া, দাঁড়া—

তাঁতিদের দোকানের সামনে আসিয়া তাঁহারা দাঁড়াইলেন।

দড়ির উপর আট দশখানা শাড়ী ঝুলিতেছিল। একখানা বলরামের ভারী পছন্দ হইয়া গেল। ময়ূরকণ্ঠী রঙ—চিক্‌চিকে রোদ লাগিয়া তাহার জেল্লা যেন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। গৌরাঙ্গী মেয়ের গায়ে তাহা কী রকম মানাইবে ভাবিয়া বলরাম মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁতের কাপড় বলিয়াই ঠাস্‌-বুনানী নয়, সেই জন্য অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হয়।

তনুদেহের লাবণ্য তাহাতে ঢাকা পড়ে না—বরং মাঝে মাঝে অঙ্গের অস্ফুট আভাস দিয়া আরো মাতাল করিয়া তোলে।

আচ্ছা, মুক্তোকে কেমন মানাইবে? অবশ্য মুক্তোকে খুব ফর্সা বলা চলে না, তা ছাড়া নোনার দেশে আসিয়া তাহার রঙ যেন ময়লাই হইয়াছে আর একটু। তবু ভালোই দেখাইবে তাহাকে। মুক্তোর সুগঠিত দেহটা বলরামের মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া গেল।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, শাড়ীর দাম কত হে?

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই যে সন্ধ্যা হইয়া বসিবে, ইহা তো জানা কথা। সেটা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া জুটিলেন।

—কি হে, শাড়ী কেনা হচ্ছে নাকি?

কবিরাজ চমকিয়া তাকাইলেন। তারপর হরিদাসের বাঁকা হাসি বিচ্ছুরিত মুখখানার দিকে চাহিয়া ঠোঁটটাকে একবার চাটিয়া লইলেন। জড়িতস্বরে কহিলেন, কে, কে বলছে আমি শাড়ী কিনছি? একখানা গামছা কেনবার জন্যে—

ময়ূরকণ্ঠী-রঙ শাড়ীখানার ওপরে আঙুল রাখিয়া হরিদাস বলিলেন, গামছা? কিন্তু এখানাকে ঠিক গামছা বলে তো মনে হচ্ছে না ভায়া। কি হে জোলার পো, এ তোমাদের কোন্ নতুন ফ্যাশানের গামছা আমদানি করেছ?

রসিকতা উপভোগ করিয়া জোলার পো মৃদু হাসিল। এক জোড়া কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক হইতে তিনটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এঁজ্ঞে না, ওখানা গামছা নয়—শাড়ীই।

—বটে, বটে? কবিরাজের চোখে তা হলে চাল্‌সে ধরেছে আজকাল। গামছা আর শাড়ীর তফাৎ বুঝতে পারো না?

মনে মনে দাঁত খিঁচাইয়া প্রকাশ্যে কবিরাজ অসহায় স্বরে কহিলেন, যাও—যাও।

—যাব মানে? এই গাজীতলায় দাঁড়িয়ে এম্নি মিথ্যে বলছ ভায়া, কাজটা কি ভালো হচ্ছে? একটু সাজগোজ করানোর ইচ্ছে মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে—সেটাকে গোপন করে আর কী লাভ?

বলরামের নির্বিরোধ শান্ত মূর্তিটির তলা হইতে যেন একটা আগ্নেয়-গিরি ফুটিয়া বাহির হইল। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা থাকিতে আছে।

—থামো, থামো ঢের হয়েছে। তোমার মতো অসভ্য ছোটলোক আমি আর দুটো দেখি নি।

—ওরে বাস্ রে! থুঁৎনির নীচে হাত রাখিয়া হাঁ করিয়া হরিদাস বলরামের দিকে চাহিলেন।

—হাঁ—হাঁ। যেন ইয়ে একটা—

বলরাম কথাটা শেষ করিলেন না—বোধ হয় শেষ করিবার মতো কিছু একটা পাইলেন না বলিয়াই। শুধু রাধানাথের হাতটা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাধানাথ একটা হোঁচট খাইল, একটা বেগুনের ঝুড়ি উল্টাইয়া পড়িল এবং দোকানদার অশ্রাব্য গালাগালি সুরু করিল। পোস্টমাস্টার বাঁ হাতে একটা তুড়ি বাজাইয়া সজোরে কহিলেন, দুর্গা-দুর্গা।

রাধানাথকে টানিতে টানিতে বলরাম প্রায় খালের কাছে আনিয়া ফেলিলেন।

রাধানাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন বাবু! মাছ কিনতে হবে না? আর দেরী হলে তো—

—মাছ—মাছ! ব্যাটার আছেই তো কেবল খাই খাই। হরিদাসের

বেলায় যে দাঁতখিঁচুনিটা মনে মনে আত্মগোপন করিয়াছিল, রাধানাথের ক্ষেত্রে সেটা আর অপ্রকাশ রহিল না।

রাধানাথ সংকুচিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমার নিজের জন্তে নয়, দিদিমণি বলছিলেন বোয়াল মাছের কথা—তা নিকটে অ্যাই রাক্ষুসে বোয়াল উঠেছে দেখলুম তাই—

—দিদিমণি! রাধানাথকে কথাটাও আর শেষ করিতে হইল না: তবে এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলি, শুনি? কাজে ফাঁকি দিতে পারলে আর কথা নেই। যা, যা, এক্ষুনি যা, দৌড়ে—

হরিদাস ততক্ষণে জোলার পোর সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছেন। —ঢাকায় গেছ কখনো, ঢাকায়?

বিনাত হাসির সঙ্গে বিনীততর প্রত্যুত্তর আসিল, আজ্ঞে না।

—তবে বুঝতে পারবে না। ঢাকাই মস্‌লিন্ সে যে-সে ব্যাপার নয়। আমি তখন মাণিকগঞ্জে থাকি। সেখানকার একজিবিশনে এক তাঁতি একবার একটা আমের আঁটির ভেতর পুরো বিশ গজী এক থান মস্‌লিন পুরে নিয়ে এসেছিল! সে কী সূক্ষ্ম কারবার! তাই দেখে লাট সাহেব নিজে তিন মিনিট ধরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন—হুঁ, হুঁ! একজিবিশন বোঝো তো?

—হেঁ—হেঁ—তা আজ্ঞে বসুন না, একছিলিম তামাক সেজে দিই।

৪

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বাড়ীর পত্র পাইলাম। পোস্টমাস্টার মশাই ভদ্রতা করিয়া নিজের লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেশ সৌজন্য আছে। তা ছাড়া ওঁর চরিত্রে কতকগুলি বিচিত্র অভিনবত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই। সাধারণত্বের মধ্যে সে গুলিকে অসাধারণ বলা যাইতে পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কুশ্রী চেহারার একটা অশোভন মলাট দিয়া ভিতরের অনেকখানি গভীর রহস্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন লোকটি। এক একদিন সেই রহস্যটাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিবার জন্য কৌতূহল জাগে।...

......কিন্তু আর কতদিন কালুপাড়ায় থাকিতে হইবে জানি না। আদায়ের দিক দিয়া কতটা সুবিধা হইবে তা-ও বুঝিতেছি না। সবাই মজাঃফর মিঞার দলে ভিড়িয়াছে। দুর্বৎসর কিনা জানি না, কিন্তু দুর্বুদ্ধির পরিচয় পাইতেছি।...

বাড়ীর চিঠিতে রাণী অনেক করিয়া মিনতি করিয়াছে। এমন ভাবে বিদেশে পড়িয়া থাকার কী সার্থকতা আছে? দেশে যে জমিজমা আছে তাহার দেখাশুনা করিলেও তো মোটা ভাত-কাপড় একরকম চলিয়া যায়। তবে এই সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য এমন একটা অনাত্মীয় সুদূর জগতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া কী লাভ?

একথা আমি অনেকবার ভাবিয়াছি। এখনও যে না ভাবি তা-ও নয়। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আর একটা যেন দার্শনিক দৃষ্টি খুলিতেছে। অনেকদিন পরে মনের মধ্যে এই সংশয়টাই মাথা চাড়া দিয়াছে যে,

যেটাকে আমরা এতদিন পরিণতি বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেটাই ঠিক পরিণতি কি-না। জীবনের যে সভ্য, মার্জিত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আমরা বাস করি, তাহার উল্টা পিঠে দেখিবার মতো কি কিছুই নাই।

কে বলিবে নাই! জীবন যে কতখানি নগ্ন ও অসংকোচ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, এখন তো তাহাই দেখিতেছি। এতদিন নগ্নতাটাকে অবিমিশ্র মন্দ বলিয়াই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আজ কিন্তু তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের গ্রামের বাড়ীতে—যেখানে সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে—শংখের শব্দে আকাশ মুখর হয়, ভাঁট ফুলের গন্ধে গ্রামের বাঁশ-ঝাড়-ঢাকা নির্জন মেটে পথখানি মদির হইয়া যায়, সেখানে জীবনের পরিধি কতটুকু! ওই মেটে পথটা ধরিয়া হাঁটিতে সুরু করিলে গ্রামের ছোট বাজারটি—তারপর আরো একটু অগ্রসর হইলে কালো কাঁকর-পাতা প্ল্যাটফর্ম—টিনের শেড্ দেওয়া ছোট্ট স্টেশন—তারপর ডেলি-প্যাসেঞ্জারী। সন্ধ্যায় ওই পথটি দিয়া যে ফিরিয়া আসে ধূপের গন্ধ ভরা ছোট্ট একখানি ঘরে রাণীর মুখখানা ছাড়া সে আর কী কল্পনা করিতে পারে!

কিন্তু এখানকার প্রকৃতি অমার্জিত—এখানে মানুষ নদী আর সমুদ্রের সমস্ত রুদ্রতার সহিত মুখোমুখি সংগ্রাম করিয়াই টিঁকিয়া আছে। ছোট ঘরের সীমানায় ছোট এতটুকু প্রেম কী এখানে মানাইত? সমস্ত নীতি, সমস্ত শৃংখলাকে ভাঙিয়া যে বর্বর যৌবন এখানে মুক্তি পাইয়াছে, স্বামীর মাথা ইঁটের ঘায়ে ভাঙিয়া দিয়াই তাহা পটভূমির মর্যাদা রাখে।

জীবনের কোন্ রূপটা যে ভালো, আজ যেন সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

বর্মিটা হাসিতেছিল।

হাসিটা অবশ্য তাহার স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। তাই পাথরের মতো কঠিন মুখ হইতে যে হাসিটা বাহির হইতেছিল, তাহা কৌতুকে ক্রূর এবং অনেকটা নৃশংস বলিয়া মনে হইতেছিল।

অবশ্য তাহার হাসির স্বরূপ বুঝিবার জন্য ডি-সুজার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। সে গঞ্জালেসের গুণ-গান করিতেছিল, লিসির জন্য এমনি সুপাত্র অন্যত্র দুর্লভ। তাহাদের পূর্ব পুরুষের গৌরব-কীর্তি কে-না জানে। বাহুবলে তারা সমগ্র দেশ জয় করিয়াছে, আগুন লাগাইয়াছে, লুঠ-তরাজের সাহায্যে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। জোর করিয়া "জেণ্টুর"-দের রূপসী মেয়েবউ ছিনাইয়া আনিয়া অঙ্কশায়িনী করিয়াছে। তাহারা যদি বীর না হয় তো, বীর কে? শুনিয়া বর্মিটার হাসি হঠাৎ থামিয়া গেল।

—তোমাদের ভেতর এটাই কী মস্ত বীরত্বের কথা নাকি?

—কোনটা? বর্মির প্রশ্নটা ডি-সুজার কানে কেমন বিচিত্র রকমে অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল যেন। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন কিছু একটা আবিষ্কার করিতে চাহিল।

—এই মেয়েমানুষ চুরি করে নিয়ে যাওয়াটা?—পাথর বাঁধানো মুখের ভিতর হইতে সামান্য একটু ফাঁক দিয়া আবার এক ঝলক কৌতুকের হাসি পিছলাইয়া পড়িল।

ডি-সুজা অপ্রতিভ বোধ করিল যেন। মনে হইল কথাটা না কহিলেই বোধ হয় ভালো হয়ত। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কলাই-করা দুইটা এনামেলের কাপে লিসি চা লইয়া আসিল।

ডি-সুজার বাড়ীর ভিতরের আঙনটিকে বেশ ভালোই বলিতে হইবে। সুপারী আর নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়া সেখানে একটা কুঞ্জ

রচনা করিয়াছে। এলোমেলো পাতার ফাঁকে খানিকটা রোদ আসিয়া লিসির মঙ্গোলিয়ান মুখের উপর পড়িল।

বর্মিটি সেইদিকে চাহিল। চাহিল স্থির বিকারহীন দৃষ্টিতেই। কিন্তু আজ যেন কী এক মন্ত্রবলে নতুন করিয়া চোখ খুলিয়া গেছে ডি-সুজার। তাহার মনে হইল বর্মির নীরব গাম্ভীর্যের তলা হইতে সাপের মতো প্রলোভনের একটা গুপ্ত ফণা মাথা তুলিতেছে। সে নিজে অনিন্দ্য-চরিত্রের লোক নয়, মানব মনের অন্ধকার জগৎটার কোনো রহস্যই অপরিচিত নাই তাহার; বর্মির লোলুপ দৃষ্টিটার মধ্যে তাহার বিগত পাশব যৌবন যেন ছায়া ফেলিয়া গেল।

লিসি চায়ের বাটিটা রাখিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সে সেদিকে যে চাহিয়া রহিল, রহিলই। ডি-সুজার অত্যন্ত অস্বস্তি লাগিতে লাগিল।

—তোমরা এখান থেকে কবে যাচ্ছ?

বর্মি মুখ ফিরাইল। তাহার সমস্ত অবয়বে আবার সেই অবিচল কঠিনতা: তোমার কাছ থেকে হিসাবটা পেলেই চলে যাব। সব চালান হয়ে গেছে?

—না, তিন সের বাকী আছে এখনো। পুলিশের বড় কড়াকড়ি এবার। তা ছাড়া জোহানের জন্যেও বড্ড ভাবনায় পড়েছি। সহরে এখনো যায় নি বটে, কিন্তু যখন-তখন খবর দিয়ে দিতে পারে। তা হলে তো সব শুদ্ধ—

আচ্ছা সে ভাবনা ভাবতে হবে না। যা বলেছি তা মনে আছে তো?

—তা আছে। কিন্তু— ডি-সুজা অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্তভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল, একটু বেশি হয়ে যাবে নাকি? একেবারে—

বর্মির মুখ হইতে সোনা-বাঁধানো দাঁত দুইটা যেন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

—বেশি ? বেশি কিছুতেই হয় না। সেদিনের টোটা দুটো নেহাৎই বাজে খরচ হয়েছে; নইলে আজ্‌কে আবার এই নতুন খাটুনির দরকার হত না।

—তা বটে।—ডি-সুজাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইল।

—তোমার নাত্‌নী রাজী হয়েছে তো ?

এই লোকটার মুখে লিসির কথা শুনিয়া মনটা যেন প্রসন্ন হইয়া ওঠে না। তবু ডি-সুজা কহিল, হুঁ। রাজী না হয়ে কী করবে ? তবে সবটা বলা হয় নি—এতখানি শুনলে হয়তো বা—

—যাই বলো, তোমার নাত্‌নীটি কিন্তু দেখতে ভালো। ওসব গঞ্জালেস্‌-টঞ্জালেসের চেয়ে—কথাটার মাঝখানেই কি ভাবিয়া সে থামিয়া গেল।

ডি-সুজার মুখ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল : গঞ্জালেসের চেয়ে কী ?

—না কিছু নয়। কিন্তু তোমাদের পর্তুগীজদের বীরত্বটা কিন্তু ভারী চমৎকার। যে যত মেয়ে চুরি করে আনতে পারে সে তত বড় বীর—বাঃ !

ডি-সুজা গম্ভীর হইয়া রহিল।

—আচ্ছা, আমি চললুম। পরশু দিনের কথা মনে থাকবে তো ?

—থাকবে। তার আগে গাজী সাহেবের কাছে যেতে হবে।

—হুঁ।

অভিবাদন জানাইয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু দরজার মুখে একবারটি থামিয়া দাঁড়াইল। একরাশ পেঁয়াজ-কলি লইয়া লিসি ভিতরে আসিতেছে।

লিসির দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সে মৃদুভাবে একটা শিস দিল, তারপর চুরুট ধরাইয়া বড় বড় পা ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রোজকার মতো সকালের ডাক আসিয়াছিল।

কেরামদ্দি মেল ব্যাগগুলি কাটিতে প্রথমেই একখানা লম্বা খাম ঠক্ করিয়া একেবারে পোস্টমাস্টারের কোলের কাছে আসিয়া পড়িল।

অফিসের খাম। পোস্টমাস্টার ব্যগ্র হাতে খুলিয়া দেখিলেন, যা ভাবিয়াছেন—ঠিক তাই। পোস্ট্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মানুষটা তা হইলে নিতান্ত খারাপ নয়। বরিশাল হইয়া যাওয়ার পথে লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইতে হইবে।

—ছুটির অর্ডার এসেছে রে কেরামদ্দি। পোস্টমাস্টারের মুখ চোখ হইতে আনন্দ উছলাইয়া পড়িতেছিল, কণ্ঠস্বরে সেটা আর চাপা রহিল না।

—ছুটি! দরখাস্ত করেছিলেন বাবু?

কেরামদ্দি যেমন বিস্ময়, তেমনই ব্যথা অনুভব করিল। এই কুশ্রী দর্শন, বিগত-যৌবন ছন্নছাড়া লোকটার উপর তাহার যে কেন এতটাই মায়া বসিয়া গেছে কে জানে।

—হাঁ, হাঁ—দরখাস্ত করেছিলুম বই কি। নইলে আমার কোন্ সম্বন্ধীটা আছে যে আগ বাড়িয়ে ছুটি দিতে আসবে? হুঁ হুঁ—তিন মাসের—সোজা ব্যাপারটি তো নয়।

—তিন মাসের! বেদনায় অত্যন্ত ম্লান হইয়া কয়েক মুহূর্ত কেরামদ্দি চুপ করিয়া রহিল। এই চর ইস্মাইল তাহারও নিজের দেশ নয়, এখানকার কাহারো সঙ্গে সে যে নিজের ভাষা বা মনের ছন্দটাকে সমানভাবে মিলাইতে পারে তাহাও নয়। পোস্টমাস্টারের সাহচর্যেই এখানে একরকম তাহার দিন কাটিয়া যায়। সেই জন্য সে এত আহত বোধ করিল যে কিছুক্ষণ কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইল না। বরং ক্ষণিকের জন্য মনে হইল, তাহার প্রতি মাস্টারবাবুর কিছুমাত্র সহানুভূতি

নাই, নতুবা তাহাকে আদৌ না জানাইয়া তিনি এমন একটা ছুটির দরখাস্ত করিয়া বসিলেন কী বলিয়া ?

নত মস্তকে চিঠি সর্ট করিতে করিতে হঠাৎ সে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে—তা হলে—অফিসের কাজ কী করে চলবে বাবু ?

বন্যার মতো অজস্র ধারায় পোস্টমাস্টার হাসিয়া উঠিলেন : শোনো কথা, কাজ কী করে চলবে ? আরে, আমি ছুটি নিলুম বলেই কী সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে ? রিলিফ আসবে—রিলিফ। কাল পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

—ওঃ। কেরামদ্দি আবার চিঠি পত্রের মধ্যে তলাইয়া গেল।

পোস্টমাস্টার একান্ত প্রসন্ন স্বরে কহিলেন, সত্যি ব্যাটারা এবারে ছুটি না দিলে রিজাইন্ দিতুম ঠিক। কাঁহাতক আর পারা যায় ? কিছুদিন থেকেই মন চঞ্চল হয়ে উঠছে—কেবল ভাবছি ছুটে বেরিয়ে পড়ি। যাক্।

—তা হলে এখন বাড়িই যাবেন তো বাবু ?

—বাড়ি! হরিদাস এমন ভাবে কথাটা কহিলেন যেন এতবড় একটা অসম্ভব ধারণা কাহারো কল্পনায় আসাটাই অসঙ্গত ব্যাপার। বাড়ি! বাড়ি কোথায় যে যাব ?

—সে কি বাবু! তিন বছর বাদে একবার ছুটি নিলেন—ছেলেমেয়ে রয়েছে—

—ব্যাস্ ব্যাস্! ছেলেমেয়ে রয়েছে তো সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আর কি! আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, ওই কাকের বাচ্ছাগুলো পিণ্ডি দেবে, এই আশংকায় আমার বাপ-ঠাকুরদা গয়ার প্রেত-শিলা থেকে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছেন।

কথাটার অর্থ না বুঝিলেও ভাব গ্রহণ করিতে কেরামদ্দির অসুবিধা হইল না। সে বিস্ফারিত চোখে কহিল, আপনার মনটা কি পাথর

দিয়ে তৈরী বাবু? গোরু ছাগলেও নিজের বাচ্ছাকাচ্ছাকে ভালোবাসে, আর আপনি—

অসমাপ্ত কথাটাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া পোস্টমাস্টার বলিলেন, আর আমি গোরু-ছাগল নই বলেই ওদের চাইতে আমার বুদ্ধি একটু বেশি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—অ্যাঁ! যে রাস্কেল্টা লিখেছিল, তাকে একবার হাতের কাছে পেলে দেখে নিতুম।

—তা হলে কোথায় যাবেন, বাবু?

—কোথায়? হরিদাসকে চিন্তিত দেখাইল: এখনো ঠিক করি নি। হয়তো কাশ্মীরে যেতে পারি—ভূ-স্বর্গ বলে তাকে। হাউস্ বোটে করে ডাল্ হ্রদে ঘুরে বেড়াব। উলার হ্রদ থেকে পদ্ম তুলে আনব। শ্রীনগর —the Venice of the East! আর নয়তো বা তিব্বতেও একবার ঘুরে আসা যায়। লামার দেশ—হাজার হাজার বছর ধ'রে এভারেস্টের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে মানুষ যেখানে মড়ার মতো ঘুমিয়ে আছে।...

পোস্টমাস্টারের আবিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কেরামদ্দি চুপ করিয়া গেল।

পূর্ণিমার দিনে জোয়ারের জল একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে। অন্যান্য দিন ওই কাদা-মাখা তীরটাকে ডুবাইয়া দিয়াই সে খুশি থাকে, আজ কিন্তু পৌঁছিয়াছে সাম্‌নের মাঠটার একবারে উঁচু ডাঙাটা পর্যন্ত। বাঁ-পাশের খালটা অনেকখানি ভরিয়া উঠিয়াছে, চেষ্টা চরিত্র করিলে বজরাটাকে একেবারে গ্রামের মধ্য পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন নয়।

বজরাটা জলের সঙ্গে অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে—নোঙরের পাকানো মস্ত নারিকেলের দড়িটাতে টান পড়িয়াছে। একটা কাঠের সিঁড়ি নামাইয়া দিতে সেইটা বাহিয়া মণিমোহন একেবারে তীরে আসিয়া

পৌঁছিল। গ্রামের দিক হইতে একটু বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না।
—আসবে নাকি গোপীনাথ?

গোপীনাথ ততক্ষণে বজরার সাম্‌নে একটা কাঠের চৌপাই টানিয়া লইয়া বসিয়াছিল। মাঝিরা মজাঃফর মিঞার উপহৃত মুরগী দুইটার পালক ছাড়াইতেছে। অমসৃণ লাল্‌চে চামড়ায় ঢাকা পাখী-দুটির পরিপুষ্ট নধর-শরীরের দিকে গোপীনাথের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটুখানি ভালো দুধ কিংবা দই জোগাড় করিতে পারিলে ইহাদের একটাকে দিয়া কী চমৎকার স্টু তৈরী করা যাইবে—মনে মনে সে তাহারই গবেষণা করিতেছিল।

মণিমোহনের প্রশ্নের উত্তরে ব্যস্ত চোখ ফিরাইয়া একবার সে তাকাইল মাত্র। তারপর বড় মুরগীটার ঠ্যাঙ্‌ দিয়া বিশেষ কোন একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে সম্পর্কে নিবিড় ভাবে চিন্তা করিতে করিতে উত্তর দিল, আপনি ঘুরে আসুন বাবু। আমি একটু এখানে দেখছি—মুরগীটা ভালো করে বানাতে হবে তো?

—ও, এখন থেকেই জিভে জল পড়ছে বুঝি? ছেড়ে উঠতে পারছো না? আচ্ছা থাকো—মণিমোহন হাসিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মাঠ—কিন্তু তৃণ রোমাঞ্চিত নয়। অগোছালো জঙ্গল, মাটিতে কোথাও কোথাও কাদার আভাস। এখানে ওখানে দুই চারিটা জোঁক লি-লি করে। পশ্চিম বঙ্গের শ্যামল প্রান্তর এই পলি মাটি আর নোনা-ধরা বালির দেশে আসিয়া রিক্ততার নগ্ন শ্রী ধরিয়াছে।

চলিতে চলিতে সে গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িল। যেমন হইয়া থাকে, পূর্ব বঙ্গের গ্রামের কোনো ঘন-বিন্যস্ত রূপ নাই। বাড়ী, বাগান, গোটা দুই তিন শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক পুকুর—সেগুলিতে প্রচুর পাতি হাঁস চরিতেছে। আশে পাশে দুটো একটা ছাড়া-ভিটা এবং সবটা মিলিয়া

এক ধরণের ছায়াচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা অনেকটা জুড়িয়া বিরাজ করে। এ বাড়ীর সঙ্গে ও বাড়ীর যোগসূত্রটা অনেকখানি গৌণ বলিয়াই বোধ হয়, যাতায়াতের পথটা তেমন অনুকূল নয়। আধভাঙা কাঠের বা বাঁশের ‘চার’ পার হইয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নালা ডিঙাইয়া চলিতে হয়। পরিচ্ছন্ন অঙ্গনে স্তূপাকারে ধান ও খড়ের পালা, দুটি একটি গোরু-মহিষ এবং চরিয়া বেড়ানো ছোট বড় অসংখ্য মুরগীই এ সমস্ত গ্রামের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

গ্রামের মধ্য দিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। দেখিবার কিছুই নাই। বসিয়া খাইবার জো নাই, পুরুষেরা বেশির ভাগই সকাল বেলা নৌকা লইয়া “চরে” কাজ করিতে গিয়াছে, জেলেরা গিয়াছে বেড়াজালে মাছ মারিতে। গ্রাম জুড়িয়া এখন মেয়েদেরই আধিপত্য। সন্ধ্যার সময় পুরুষগুলি ফিরিবে, তাই সারাটা দিন তাহাদের ঢেঁকি চালানো, ধান গুছানো, আরো দশটি খুঁটিনাটি কাজ এবং অশ্রান্ত গাল-গল্পের মধ্য দিয়াই কাটিয়া যায়। কেহ ছেলেকে স্নান করায়—অপরিচিত লোক দেখিয়া হঠাৎ গায়ে-বুকে কাপড় টানিয়া সংযত হইতে চায়। কেহ বা কালো শাড়ীর লম্বা ঘোমটার ভিতরে রূপার নথটার মধ্যে আঙুল পুরিয়া দিয়া কৌতূহলী চোখে চাহিয়া থাকে।

দু’ একজন পুরুষের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হইয়া গেল তাহারা সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল। কেউ কেউ বা একান্ত বিনীত হইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: বেড়াতে এসেছেন না কি হুজুর?

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিল। তাহার মন তখন লক্ষ্যহারা হইয়া কোথা হইতে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিতেছে। নদীর বুক হইতে জাগিয়া ওঠা নতুন মাটি—নতুন উপনিবেশ। ঠিক পুরানো পৃথিবীর মতো করিয়াই মানুষ এখানে ঘর বাঁধিয়াছে। কিন্তু

দেখিয়া যা মনে হয়, সত্যি সত্যিই তার সঙ্গে কত ব্যবধান রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রথম যুগের মতো গলিত ধাতুপাত্রের উপর শীতল একটা আস্তরণ পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু বুকের মাঝখানে অসংযমের তরল উত্তপ্ত বস্তুটা টগবগ করিয়া ক্রমাগতই ফুটিতেছে। যখন একটা বিশেষ উপলক্ষ বা ছিদ্র ধরিয়া তাহা বাহির হইয়া আসে তখনি বোঝা যায়—যা দেখা যাইতেছে সেইটাই সত্য নয়।

—এই যে সরকারীবাবু।

সরকারীবাবুটিকে চকিত হইয়া থামিয়া পড়িতে হইল। কোথা হইতে সেই বর্মী মেয়েটি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা ছোট গামছায় বাঁধা একরাশ মুরগীর ডিম। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝক্‌মকে মুক্তার মতো দাঁতগুলিকে বিকশিত করিয়া সে কহিল, আমাকে চিনতে পারছ না? সেই যে সেদিন তোমার দরবারে আসামী হয়েছিলুম—আমার নাম মা-ফুন।

চোখ দুটি বড়ো বড়ো করিয়া মণিমোহন সকৌতুকে বলিল, চিন্‌তে আবার পারব না? যে ইঁট মেরেছিলে সেদিন—আর একটু হলেই—

—সত্যিই? ঝর্ণার মতো কলচ্ছন্দে মেয়েটা হাসিয়া উঠিল; আস্তে মেরেছিলুম বলেই বেঁচে গেছে। ইচ্ছে করলে একবারেই দিতে পারতুম ঠাণ্ডা করে।

—তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তোমার স্বামীর মাথার ঘা সেরেছে তো?

—সারবে না?—মা-ফুন ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, মাসের মধ্যে তিনবারই ও একরকম মার খায় যে। পড়ে থাকবার জো আছে নাকি? তা হলে আর খেতে হবে না।

—মাসের মধ্যে তিনবার! লোকটির জায়গায় নিজেকে একবার কল্পনা করিয়াই আতঙ্কে মণিমোহন শিহরিয়া উঠিল।

—এদিকে কোথায় এসেছিলে বাবু?

জাতে বর্মী বা যাহাই হউক এবং স্বামীকে নির্মমভাবে প্রহার করিতে যতই অভ্যস্ত হউক, ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের এই নিরিবিলি পটভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব সুন্দরী বিদেশিনী যুবতীটির সঙ্গে গল্প করিতে মণিমোহনের নেহাৎ মন্দ লাগিতেছিল না। চাঁপার কুঁড়ির মতো সুঠাম কয়েকটি আঙুল গালে রাখিয়া আয়ত জিজ্ঞাসু চোখে সে চাহিয়া আছে, ওই চোখ, ওই আঙুল দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে যে কথায় কথায় একখানা থান ইঁট তুলিয়া সে যখন তখন ধাঁই করিয়া মারিয়া দিতে পারে!

মণিমোহন বলিল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

—সত্যি? মেয়েটা মৃদু হাসিল, কিন্তু অবিশ্বাস করিল না। বরং তাহার চমৎকার নীল চোখ দুটি হইতে জয়ের গর্ব যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে জানে তাহার রূপ আছে এবং সেই রূপ-সম্পর্কে একেবারে অচেতন থাকিবে এতটা নিষ্প্রাণ সে কাহাকেও আশা করে না।

মণিমোহনের বয়স বেশি নয়। দেখিতে সে-ও সুশ্রী। হঠাৎ তাহার কাটখোট্টা স্বামীটির সঙ্গে একটা অদৃশ্য তুলনা-বোধ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া যেন তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে? তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চল না আমার বাড়ীতে।

—তোমার বাড়ী? কোথায় সে?

হাত দিয়া মেয়েটি অল্প দূরে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে একখানা টিনের ঘর দেখাইয়া দিল, বলিল, ওই যে। এলেই যখন তখন একবার না হয় দেখেই যাও।

—আচ্ছা চলো। কিন্তু তোমার সঙ্গে যেতে ভয় করে।

—ভয় করে? কেন? মেয়েটা হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল, তাহার স্নিগ্ধ চোখ দুটী যেন নীলার মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন কিছু একটার প্রত্যাশা করিতেছে সে।

কিন্তু মণিমোহন সেটা বুঝিতে পারিল।

সে সকৌতুকে বলিল, ভয় করবে না? তোমার হাত দুখানা যা চলে তার থেকে যতটা দূরে সরে থাকা যায় ততই ভালো।

—ওঃ, বলিয়া মা-ফুন চুপ করিল।

এই নিরিবিলি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই বাড়ীটা যেন আরো বেশি নিরিবিলি। প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায় ইহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলে। ইহারা বৌদ্ধ—আচারে-বিচারে মুসলমানদের সঙ্গে খুব যে বেশি তফাৎ আছে তা নয়—তবু নিজেদের হিন্দু বলিয়াই মনে করে। তা ছাড়া বর্মা দেশ-সুলভ ইহাদের বিচিত্র ভাষা এবং বিচিত্রতর রীতি-নীতি প্রতিবেশীদের কাছে অনেকটা অপরিচিত বলিয়াই তাহাদের সংস্রব কম।

—এসো বাবু, মেয়েটি ডাকিয়া একেবারে ঘরের ভিতরেই তাহাকে লইয়া গেল।

সামনেই একটা বাঁশের মাচা। এক পাশে কতকগুলো কাপড় চোপড় জড়ো করা। রংচঙে একটা মশারি ঝুলিতেছে। বেড়ার গায়ে প্যাগোডার একখানা বড় ছবি, দুর্বোধ্য বর্মী হরফে তাহার নীচে কিছু একটা লেখা রহিয়াছে।

মাচার উপর বসিয়া মণিমোহন বলিল, তোমার স্বামী কোথায়?

—স্বামী? সে তো এখানে নেই। সহরে গেছে—তিন চার দিন পরে আসবে।

—তাই নাকি? তা তো জানতাম না। মণিমোহন অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার মনে হইল নির্জন ঘরে সুন্দরী তরুণীটির সঙ্গে বেশিক্ষণ না থাকিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

—আমার ঘরটা কেমন দেখছ সরকারীবাবু?

—মন্দ কী, বেশ তো?

মেয়েটা হাসিল: উঁহু, বেশ নয়। গরীবের ঘর যে। তোমাকে মৌলমিনে নিয়ে যেতে পারতুম তো দেখতে। আমার বাবার সেখানে কাঠের কারবার আছে—অনেক টাকা।

—তা হবে। এখন চলি তা হলে—মণিমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

—চলে যাবে মানে? এসেই চলে যাবে তাই কি হয়? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে যেন বিস্ময় প্রকাশ পাইল: একটু চা করে দিতে পারি। তোমরা বাঙালিরা যা খাও তা-ও করে দেওয়া অসম্ভব নয়—আমি লুচি বানাতে জানি। ভয় নেই, তার সঙ্গে "ঙাপ্পি" মিশিয়ে দেব না।

মেয়েটির কথার ভঙ্গি হইতে এটা বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে হিন্দু-সমাজের সহিত তাহার নিছক অপরিচয় নাই। নিশ্চয়ই কখনো না কখনো ভদ্রলোকদের সঙ্গে সে মিশিয়াছে এবং তাহাদের নিয়ম কানুন তাহার একেবারেই অজানা নয়।

মণিমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, আমরা যে লুচি খাই তা তুমি কেমন করে জানলে?

—এমন চমৎকার বাংলা বলতে শিখলুম কোথায় তাতো জিজ্ঞাসা করলে না। আমরা অনেকদিন ঢাকায় ছিলুম যে। তোমাদের বাঙালিদের সঙ্গে ঢের মিশেছি। আমার এক বোনেরই তো বিয়ে হয়েছে বাঙালির সঙ্গে।

—তা তুমি এখানে এসে পড়লে কী করে?

—কপাল, সব কপালের ফের। আমার স্বামীটিকে কি সোজা লোক দেখছ? দুনিয়ার আর কোথাও জায়গা হয় না বলে এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। ও না মরলে আমার আর শান্তি নেই।

পতিভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু আর দেরী করা চলে না। উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল, কিন্তু আমার কাজ রয়েছে; এখন আর বসতে পারব না।

—কাজ থাকলে কী হবে? তোমাকে চা খেয়ে যেতে হবে যে। এখানে এই সৃষ্টিছাড়া দেশে পড়ে আছি বটে, কিন্তু চায়ের সব বন্দোবস্তই আছে আমাদের। বাঙালিদের চাইতে আমরা নেহাৎ খারাপ চা করতে জানি না।

মণিমোহন হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু দশটা বাজে। সত্যিই আর বসতে পারব না। আচ্ছা, আর একদিন এসে তোমার চা খেয়ে যাব।

—সত্যি খেয়ে যাবে তো! কবে আসবে?

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া মণিমোহন চমকিয়া উঠিল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্নটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেটা যেমন আন্তরিক, তেমনই বিচিত্র। নিতান্ত পরিচয়ের সূত্র হইতে যতটুকু আশা করা চলে, তাহার চাইতে যেন অনেক বেশি গভীর।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, প্রশ্নটাকে একেবারে এড়াইয়া যাওয়া চলে না। তাই নিতান্ত সাধারণভাবে হইলেও তাহার গলায় একটা প্রতিশ্রুতির সুর আসিয়া গেল।

—পরশু, বিকেল বেলা।

—ঠিক আসবে, ঠিক তো?—মা-ফুনের জিজ্ঞাসা এবার অনেকটা দাবীর মতোই শুনাইল।

—ঠিক আসব।

—না এলে—মেয়েটা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল: আমাকে তো জানোই। বোট থেকে তোমাকে সোজা টেনে নিয়ে আসব। আর নইলে আমার হাতের থান ইঁট কেমন চলে তার তো প্রমাণ পেয়েছই।

কথাটা ঠাট্টা বটে, কিন্তু একেবারে ঠাট্টা বলিয়াও মনে হইল না। বুকের ভিতরটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল মণিমোহনের। এই অভিনব মেয়েটির নীল চোখ দুইটিকে বিশ্বাস নাই—যখন-তখন নীলকান্তমণির মতো তাহার দ্যুতি বদ্‌লায়।

হাসিয়া সে-ও উত্তর দিল, আচ্ছা, মনে থাকবে।

ঘর হইতে সে দুই পা বাহির হইতে না হইতেই মা-ফুন চট্ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল: হাঁ, আর একটা কথা। তুমি কিন্তু একাই আসবে সরকারীবাবু, তোমার সঙ্গের ওই খাতা লেখা বাবুটিকে আবার জুটিয়ে এনো না।

সন্দিগ্ধ ও বিস্মিত কণ্ঠে মণিমোহন কহিল, কেন?

—এম্‌নি। আমার স্বামী বেশি লোক-জনের গোলমাল সইতে পারে না। ওর আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল।

—মাথার ব্যারাম! তা হলে সেটা তোমার জন্তেই হয়েছে, বলো?

মেয়েটির মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই রহিল, তা হবে। কিন্তু পরশু বিকেলে তুমি সত্যিই আসবে তো?

—আসব।—আর একবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মণিমোহন বাহির হইয়া গেল।

রিলিফ্ আসিয়া পড়িল।

যে ভদ্রলোক আসিলেন, তিনি মুসলমান—বরিশাল জেলাতেই বাড়ী।

এই চর ইস্‌মাইল হইতে একখানা ডিঙি করিলে তিন ঘণ্টায় তাঁহার বাড়ী গিয়া পৌছানো যায়। সুতরাং এমন সময়ে এহেন নির্জন চরের দেশে বদ্‌লি হইয়া আসিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না। বরং এখানে স্থায়ী হইয়া থাকার জন্ত পোস্ট্যাল্‌ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে একটা দরখাস্ত করিবেন বলিয়াই তিনি স্থির করিয়াছেন।

খুব খুশি হইয়াই অভ্যর্থনা করিলেন হরিদাস সাহা!

—এসো, দাদা এসো, তোমাদেরই দেশঘর, দেখে শুনে নাও। আমাদের আর কি, যাওয়ার জন্তে তো পা বাড়িয়েই আছি।

নতুন পোস্টমাস্টার আপ্যায়িত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করিলেন:

—যান—বাড়ীর থেকে ঘুরে-টুরে আসুন। এ যা দেশ মশাই—এখানে এলে তো দুনিয়ার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই থাকে না। কিছুদিনের জন্তে বাড়ীর থেকে মুখ বদলে আসুন।

—বাড়ী!—হরিদাস হাসিয়া উঠিলেন: আমাদের তো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্‌' ভায়া—কোন্‌টা যে বাড়ী আর কোন্‌টা নয়, তাই এ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারলুম না। আরে কবিরাজ যে! কী মনে করে—শুনি?

সে কথার জবাব না দিয়াই কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সব কী ব্যাপার?

—কী সব?

—তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—অগত্যা। থাকতে যখন পারছি না তখন তো যেতেই হবে। ভায়া হে, পৃথিবীটা অনেক বড়ো, আয়ুও তো প্রায় ফুরিয়ে এল। কাজেই সুযোগ থাকতে বেরিয়ে পড়া যাক্‌—যতটা দেখে নেওয়া যায়, ততটুকুই ভালো।

—হুঁঃ—বলরাম যেমন ক্লিষ্ট, তেমনই বিষণ্ণ হইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহার বিষণ্ণতা হরিদাসকে স্পর্শ করিল না। স্পর্শ করিবার মতো মনই তাঁহার নয়। পরিবারের বন্ধন যাকে আঁকড়াতে পারে নাই, পৃথিবীর ঘাট হইতে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ানোই যাহার স্বভাব, তাহার মনের স্পর্শাতুরতা বেশি হইবে কোথা হইতে।

—হুঁঃ মানে? ভাবছ কি এত খালি খালি? এই চর ইস্‌মাইলের ছোট্ট ডাঙাটুকুতে একটা মেয়েকে মুখে করে নিয়ে বসে থাকলেই কি চলবে? জানো না রামপ্রসাদ বলেছেন—

'এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা—'

—তা হবে। সংক্ষেপে কথাটা বলিয়াই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বলরাম চলিয়া গেলেন। কেন কে জানে হঠাৎ তাঁহার সম্বন্ধে কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল হরিদাসের মনে।

কেরামদ্দি আসিয়া উপস্থিত হইল।

—নৌকো ঠিক হয়ে গেছে বাবু। জোয়ারটা পেলেই রওনা হতে পারবে।

—পারবে তো? যাক্ বাঁচলুম। তা হলে চট্ করে মোট ঘাটগুলো বেঁধে ফেলো কেরামদ্দি, আর মায়া বাড়ানোটা কাজের কথা নয়।

একটুখানি ইতস্তত করিল কেরামদ্দি।

—আজকেই যাবেন বাবু? তা ছাড়া এই অবেলায় নৌকো ছাড়াটা কি সুবিধে হবে? দিনকাল তো ভালো নয়,—যখন—তখন—

—কী হবে? বাতাস উঠবে, রোলিং হবে, নৌকো ডুববে? তা যা হবার হবে, শুভদিনটা ছাড়তে পারি না। একে বেস্পোতির বারবেলা,

তার ওপর অশ্লেষা, নৌকো যাত্রার পক্ষে এর চেয়ে প্রশস্ত দিন আর কী হতে পারে?

মৃদু হাসির সঙ্গে একটা তুড়ী দিয়া হরিদাস চলিয়া গেলেন।

বেলা দুইটার সময় হরিদাসের নৌকা তেঁতুলিয়ায় পাল তুলিয়া দিল।

৫

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

সমস্ত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া একটির পর একটি ঋতু-বিবর্তন চলিতেছে। যেন কালের অক্ষমালা হাতে লইয়া জীবধাত্রী পৃথিবী ধ্যানে বসিয়াছে—এই ধ্যানের মধ্য দিয়া বৎসরের শেষে সে পূর্ণতার সিদ্ধিলাভ করিবে। বসন্তের রূপ ধরিয়া সেই পূর্ণতা আসিয়া মানুষের কাছে দেখা দেয়। দিকে দিকে ফুল ফুটিয়া ওঠে—প্রজাপতি উড়িয়া যায়, পিয়াল-বনে কৃষ্ণসার মৃগ শৃঙ্গ দিয়া মৃগীকে কণ্ডূয়ন করিতে থাকে। বসন্তের বাতাসে পুষ্পশরের পাঁপ্‌ড়িগুলি স্বপ্ন ছড়াইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে এই মধু-ঋতুটা অমর হইয়া আছে।

কিন্তু যেখানে বাঁও মিলাইয়া বাঁশ পুঁতিতে হয়—বছরের পর বছর বালির নোনা ক্ষয় করিয়া নতুন মানুষের উপনিবেশ রচনা করিতে হয়—আদি-জননী সিন্ধুর কোল হইতে হামাগুড়ি দিয়া যেখানকার মাটি বেশি দূর উঠিয়া আসিতে পারে নাই, সেখানে ফাল্‌গুনী বাতাস আলাদা রূপ লইয়া আসে। পর্তুগীজদের ভাঙা-গীর্জার পাশ দিয়া যেখানে নদীর জল ঘূর্ণি রচিয়া খরস্রোতে বহিতেছে, সেখানে বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা মরচে-পড়া ভাঙা লোহার কামানটা আর এক অভিনব বসন্তের স্বপ্ন দেখে। দক্ষিণা বাতাসে গঞ্জালেসের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের মোহনা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সুরভি-চঞ্চল ফাল্গুন রাত্রিতে বাসরের মিলন-মায়াকে চূর্ণ করিয়া পর্তুগীজদের বন্দুক আর মশাল সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়ায়।

আর তখনই চর ইস্মাইল নিজের সত্যিকারের স্বরূপটাকে চিনিতে পারে: তাহার ঈশান-দিগন্তে খানিকটা সুতীব্র হিংসা মেঘে মেঘে ঘন-কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, নদীর জল শ্লেটের মতো কালো হইয়া যায় এবং তারপর—

* * * *

বিকালের দিকেই মণিমোহনের মনে হইল যে মা-ফুন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে। এই দুইদিন হইতেই বর্মী মেয়েটির স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে নানাভাবে আন্দোলন তুলিয়া ফিরিয়াছে; খানিকটা অনির্বাণ আগুনের মতো মেয়েটির রূপ—মনটাও সে আগুনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। আর তাহার পাতিব্রত্যের আদর্শটাও যেমন বিচিত্র, তেমনই উপভোগ্য। পশ্চিম বঙ্গের একটি শান্ত গ্রামে, একতলা বাড়ীর একখানি কুঠুরীতে বসিয়া রাণী সেটা কল্পনাই করিতে পারে না।

কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিতেছে এবং থান-ইঁটের কথাটাও সে ইহার মধ্যেই ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। তা ছাড়া মনের অজ্ঞাত-প্রান্ত হইতে একটা আকর্ষণও যেন সে অনুভব করিতেছিল। সমুদ্রের একেবারে মোহনায়—পৃথিবীর উপান্তে এমন একটি বিস্ময়কর বস্তু যে সে আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে এটাও নিতান্ত কম কথা নয়।

সুতরাং বাহির হইয়া পড়িতেই হইল।

বর্মী মেয়েটি বোধ হয় তাহার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ সে বেশ করিয়া সাজিয়াছে। সিল্কের ঘাঘরার উপর চমৎকার একটি রঙিন্ জ্যাকেট পরিয়াছে—মাথার চুলগুলি বেণী করিয়া চমৎকার ভাবে চূড়ার উপরে বাঁধা। কী একটা সুগন্ধিও বোধ হয় সে মাখিয়াছে, গন্ধে বাতাসটা মদির হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হইল অরণ্যের কালো অন্ধকার হইতে রহস্যময়ী কোনো রাজকন্যা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা-ফুন হাসিয়া বলিল, মনে আছে তো ?

—মনে না থেকে উপায় আছে নাকি ?

—সত্যি তুমি না এলে আমি বড্ড রাগ করতুম সরকারীবাবু। সারা দুপুর বসে খাবার তৈরী করেছি তোমার জন্যে, অবশ্য তোমাদের বাঙালিরা যা খায়।

বাঁশের মাচাটির উপর ভালো করিয়া বসিয়া লইয়া মণিমোহন প্রশ্ন করিল, কিন্তু কেন এ সব তুমি করতে গেলে ?

—কেন করতে গেলুম ?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিতেই লাগিল : তোমার বড্ড সুবিচার আছে সরকারীবাবু, তাই তোমাকে আমার মনে ধরেছে।

—মনে ধরেছে। কথাটা মণিমোহনের খ্যাচ্ করিয়া বাজিল। এমন করিয়া ভালো লাগাটা প্রকাশ করা ইহাদের পক্ষেই সম্ভব। আচ্ছা, রাণী এমন করিয়া কথাটা কি কখনও বলিতে পারিত ? মণিমোহন ভালো করিয়া মা-ফুনের দিকে চাহিল। অপূর্ব রূপসী দেখাইতেছে তাহাকে। প্রসাধনের ফলে তাহার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রূপ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে—হঠাৎ মনে হইতে পারে তাহার চোখ দুটি যেন নীল সুরার পরিপূর্ণ দুটি মদের পাত্র। তাহার তীব্র-যৌবনশ্রী দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়া যেন দিক্ দিগন্তকে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিতে চায়।

মেয়েটি ততক্ষণে একটা চীনা মাটির রাইস্-প্লেটে করিয়া একরাশ খাবার আনিয়া হাজির করিয়াছে। বেশির ভাগই ডিমের তৈরী। মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তোমার স্বামী ?

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কৌতুকের কণ্ঠে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল—হাসিটা ধারালো লোহার ফলার মতো নিষ্ঠুর এবং ঋজু। যেন এমন হাসির কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না।

—আমার স্বামী ! ও হতভাগাটার কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না দেখছি। তা সে তো মরেছে।

—মরেছে ! চমকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল : সে কী !

মেয়েটি হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল : মরবে ! আমার হাতে ছাড়া কি তার মরণ আছে। সে আজও সহর থেকে ফেরে নি।

—কিন্তু তার তো ফেরবার কথা ছিল। এই নির্জন বাড়ীতে বিচিত্র সুন্দরী এই তরুণী মেয়েটির স্বামী অনুপস্থিত—ন্যায়শাস্ত্রের দিক হইতে জিনিসটা মনোরম নয় ; কিন্তু মণিমোহনের আজ কী হইল কে জানে—তাহার অবচেতন সত্তাটা এই সংবাদে যেন খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল : ঠিক এমনটিই সে আশা করিয়াছিল বটে।

—তা হলে তো—

—তা হলে—তা হলে কী ? ভয় করছে আমাকে ? কিন্তু যা ভাবছ আমি তত খারাপ লোক নই সরকারীবাবু। সকলকে ইঁট মারা আমার স্বভাব নয়।

—কিন্তু তাই দেখছি—মণিমোহন খাবারের ডিশটার দিকে মন দিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে—নদীর উপর রক্ত ছড়াইয়া সূর্য বোধ হয় এতক্ষণে অস্ত নামিয়াছে। বাঁশ বনের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার এখানে একটু আগে হইতেই ডানা মেলিয়া দিল। মা-ফুন একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিল। সেই আলোয় তাহার মুখখানা রহস্যে যেন কোমল ও মধুর হইয়া উঠিতেছে।

মা-ফুন মণিমোহনের কাছে ঘেঁসিয়াই বসিল একরকম। তাহার বেশ-বাস হইতে একটা অপরিচিত সুগন্ধি অত্যন্ত উগ্র হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে—যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বহিয়া সে গন্ধটা সমস্ত শিরা-উপশিরাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে। অত্যন্ত কাছে ঘেঁসিয়া অতিরিক্ত কোমল

কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, খাচ্ছ না কেন? বাঙালিদের মতো তৈরী করতে পারি নি বলে?

মণিমোহন ভয়ানক ভাবে চমকিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত চেতনায় যেন ঝন ঝন করিয়া অস্বাভাবিক একটা কোলাহল বাজিয়া উঠিতেছে। আর একটু দেরী হইলে হয়তো বা সে ধরা পড়িয়া যাইবে। রক্ত যেন অস্বাভাবিক খরস্রোত সর্বাঙ্গ দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

কিছু একটা তাহার বলা উচিত, কিন্তু কোনো কথাই এই মুহূর্তে সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ইতস্তত করিয়া বলিতে পারিল, না বেশ হয়েছে, খুব খেয়েছি। তারপরে সে উঠিয়া পড়িল: আচ্ছা, অন্ধকার হয়ে গেল, আমি এখন চললুম।

মা-ফুন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কিন্তু যাবে কী করে?

—ওঃ—অন্ধকারের জন্য ঠেকবে না। আমার সঙ্গে টর্চ আছে।

—অন্ধকারের কথা বলছি না—ঝড় আসছে যে।

—ঝড়! বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল সত্যই ঝড় আসিতেছে। এতক্ষণ যেটাকে সে সন্ধ্যা বলিয়া মনে করিতেছিল, সেটা কাল-বৈশাখীর অকাল ছায়া মাত্র। নিঃশব্দে এবং অগোচরে আকাশ একেবারে কষ্টি পাথরের রঙ্‌ ধরিয়াছে, তাহার উপর কয়লার জমাট্ ধোঁয়ার মতো রাশ রাশ কালো মেঘ আসিয়া আরো বেশি করিয়া জমা হইতেছে। একদল শাদা বক সেই কালো পটভূমিটার তলা দিয়া শন শন করিয়া উড়িয়া গেল—পলকের জন্য বিদ্যুতের একটা দীর্ঘ সরীসৃপ ধূসর দিগন্তটাকে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া জ্বলিয়া গেল যেন। মনে হইল তেঁতুলিয়ার মোহনা ছাড়াইয়া, চর কুকুরার দীর্ঘ নারিকেল-

বীথিকে ডিঙাইয়া কোন্ একটা রহস্যময় দেশ আছে—সেখানকার সভা-প্রাঙ্গণে কী একটা বিরাট্ উৎসবের আয়োজন হইল। সেই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে কে মত্ত মেঘের একটা প্রকাণ্ড মৃদঙ্গে ঘা দিয়াছে ; কালো আকাশে তাহার হাতের সোনার বলয়টা ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা গম্ভীর নির্ঘোষ সমস্ত অনুষ্ঠানটারই সূচনা করিয়া দিল।

মণিমোহন বলিল, তাই তো। তা হলে আর দেরী করা যায় না। আমি চললুম।

মেয়েটি কিন্তু তাহার পথ ছাড়িল না : কী করে যাবে ? পৌঁছবার আগেই তুমি ঝড়ের মুখে পড়ে যাবে যে।

—তা পড়লেও উপায় নেই। বোটে আমাকে যেতেই হবে—মণিমোহনের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস লাগিল।

বর্মী মেয়েটির সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যেন একটা সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছিল : এ দেশের ঝড় যে কী তুমি তো তার খবর রাখো না সরকারীবাবু, নইলে—

কথাটা শেষ হইল না। সমুদ্রের ওপারে সেই যে বিরাট জলসাটা বসিয়াছিল, সেখানে যাহাদের নাচিবার কথা ছিল তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। একটা দমকা ঝাপ্টায় পিছনের সমস্ত বাগানটা তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—অনেকগুলি পায়ের নূপুরের ঝঙ্কার আকাশ-কাঁপানো একটা শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া সম্মুখে বহিয়া গেল। একরাশ ধূলা-বালি ও শুকনা পাতা আসিয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য ধূলার একটা ঘূর্ণ্যমান আবরণ ছাড়া সামনে আর কিছুই রহিল না।

মা-ফুন মণিমোহনের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে টানিয়া আনিল।

খোলা জানালা দিয়া ঝাপ্টায় ঝাপ্টায় বাঁশের পাতা আসিয়া পড়িতেছে, পাল্লা দুইটাকে ক্রমাগত আছড়াইতেছে। মা-ফুন জানালাটাকে বন্ধ করিয়া দিতে না দিতেই বার কয়েক দপ্‌ দপ্‌ করিয়া ঘরের লণ্ঠনটা নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া ঝড় আসাটা পশ্চিম বঙ্গের ছেলের জীবনে অভিনব, তাই মণিমোহন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল—মুখ দিয়া তাহার অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ বাহির হইল শুধু।

পরক্ষণেই সে অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া কোমল-দেহের একটা অত্যন্ত কঠিন বন্ধন আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অপরিচিত সুগন্ধিটার গন্ধ যেন ক্লোরোফর্মে রূপান্তরিত হইয়া তাহার স্নায়ুগুলির উপরে কাজ করিতে চায়।

চকিত হইয়া সে নিজেকে সেই বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিতে চাহিল—তাহার মনের সামনে রাণীর মুখখানা সিনেমার ছবির মতো আসিয়া দেখা দিতেছে। শরীরের প্রত্যেকটি রোমকূপে যেন অসহ্য অনুভূতি উগ্র হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ছাড়াইতে চাহিলেও সে ছাড়াইতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত গর্জনের মধ্য দিয়াও সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল: এখন তুমি আমার—আমার। জোর করে আমাকে ছাড়াতে পারবে, কিন্তু আমার কোমরের ছোরাখানাকে ছাড়াতে পারবে না।

ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ হিম হইয়া গেল।

ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়। উপনিবেশের বন্য ও উদ্দাম কামনার আগুন জ্বলিয়াছে। এ আগুনে জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে; কিন্তু অন্ধকারে মণিমোহন স্পষ্ট একখানা জ্বলজ্বলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল।

বাহিরে তখন প্রবল ঝড়ের গর্জন চলিতেছিল। সেই ঝড়ের তাণ্ডব ঘরের মধ্যেও ভাঙিয়া পড়িল।

* * * *

দরজাটা এমন ভাবে প্রবল একটা শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল যে তাহার আঘাতে সমস্ত ঘরখানাই কাঁপিয়া উঠিল। গড়গড়াটা হইতে খানিকটা ছাই উড়িয়া আসিয়া বলরামের মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল এবং দেওয়ালের গায়ে চীনামেয়েটির সেই ছবি খট্ খট্ করিয়া ঘরের ওপাশে উড়িয়া চলিয়া গেল। গ্রুপ ফটোগ্রাফ্খানা হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় ঝন্ ঝন্ করিয়া দেওয়াল-ঘড়িটার উপরে গিয়া পড়িল এবং পরক্ষণে চারিদিকে রাশি রাশি কাঁচ ছাড়া কিছু আর দেখিবার রহিল না।

বলরাম চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রচণ্ড ঝড় সুরু হইয়াছে। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, রাধানাথ—রাধানাথ?

কিন্তু কোথায় রাধানাথ? বিকালে সে আড্ডা দিতে গিয়াছিল, ইহার মধ্যে সেখান হইতে ফিরিতে পারে নাই নিশ্চয়ই। ফিরিলে অন্তত দু একবার তাহার চেহারাটা চোখে পড়িত।

দরজা-জানালাগুলি শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়া বলরাম বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। ঝড়ের গতিটা আজ ভালো নয়—বছরে প্রথম কাল-বৈশাখী উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তাহার সংঘাতটা এমন প্রমত্ত!

—মুক্তো, মুক্তো?

মুক্তোর সাড়া আসিল না।

তিন চারিদিন হইতেই মুক্তোর যেন কী হইয়াছে। ভালো করিয়া কথা বলে না সে। এমন কি ময়ূর-কণ্ঠী রঙের সাড়ীখানা দেখিয়াও সে খুশি হইয়াছে কিনা বোঝা কঠিন। এমনিতেই বলরাম তাহাকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন না, তার উপর কয়দিন হইতেই ব্যবহারটা

তাহার পুরোপুরি দুর্বোধ্য ঠেকিতেছে। মেয়েদের ব্যাধির খবর কবিরাজ জানেন, কিন্তু তাহাদের আধির সংবাদ লইবার পেশা তাঁহার নয়। সুতরাং বলরাম ভারী দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন।

কিছু একটা অসুখ-বিসুখও করিতে পারে। সেদিন তাহার এত সাধের বোয়াল মাছ কিনিয়া আনা হইয়াছিল কিন্তু সে খায় নাই। পাতে ফেলিয়াই উঠিয়া গেছে। কিন্তু অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও বলরাম কোনো উত্তর পান নাই—মুক্তো যেন তাঁহাকে এড়াইয়া চলে আজকাল।

ঝড়ের গতিটা ক্রমেই বাড়িতেছে—মুক্তোর খবরটা একবার লওয়া দরকার। হয়তো জানালাটা ঘুরিয়াই বসিয়া আছে সে। ঝড়ের মুখে জোরালো বৃষ্টির ছাট্ আসিতেছে—সব ভিজিয়া যাইবে যে।

—মুক্তো, মুক্তো ?

বলরাম মুক্তোর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

অনুমান মিথ্যা নয়। জানালাটা খোলাই আছে বটে। বাহিরে অন্ধকার দুর্যোগের দিকে সে চোখ মেলিয়া বসিয়া আছে—থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের একটা প্রখর আলোয় তাহার বিষণ্ণ মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

বলরাম ডাকিলেন, মুক্তো ?

মুক্তো উত্তর দিল না।

—মুক্তো, মুক্তো, তোমার কী হয়েছে ?

মুক্তো এইবার তাঁহার দিকে চাহিল। অজস্র জল আসিয়া তাহার সমস্ত মুখটা ভাসিয়া গিয়াছে, চুলগুলি গালের দুই পাশে আসিয়া লেপ-টাইয়া আছে। তাহার মুখ বাহিয়া যে জল পড়িতেছে, মনে হইল তাহার সঙ্গে চোখের জলও যেন মিশিয়া রহিয়াছে।

বলরাম চকিত কণ্ঠে কহিলেন, কেন, এখন তুমি এমনভাবে জানালা খুলে বসে আছো? বাইরে সাংঘাতিক ঝড় চলেছে—তা ছাড়া এ ভাবে ভিজলে অসুখ করবে। জানালাটা বন্ধ করে দাও শিগ্‌গির।

কিন্তু মুক্তো জানালা বন্ধ করিল না—কোনও উত্তরও দিল না। যেন কথাটা সে কানে শুনিতে পায় নাই। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুত ও অপরিচিত ভয়ের অনুভূতি আসিয়া তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া দিল।

দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

—কী হয়েছে তোমার? কথা বলছ না যে মুক্তো?

একটা ঝট্‌কা মারিয়া মুক্তো সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দুইটি জলে টলমল করিতেছে, এবার সে-দুটি হইতে যেন আগুন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইতে লাগিল।

অস্বাভাবিক একটা চীৎকার করিয়া উঠিল সে। শুনিয়া বলরাম যেন কাঠ হইয়া গেলেন।—কেন, কেন তুমি এমন করলে? এমন করবার কী দরকার ছিল তোমার?

জড়িত স্বরে বলরাম আবার নির্বোধের মতো শুধাইলেন, কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? এখনো তুমি জানতে চাও? তুমি না কবিরাজ? আমার দিকে চেয়েও কি বুঝতে পারছ না কী হয়েছে? এখন আমি কী করব—কোথায় যাব?

ইহার পরেও না বুঝিবার মতো নির্বুদ্ধিতা বলরামের ছিল না।

তিনি তো কাঠ হইয়াই ছিলেন, এইবার যেন পাথর হইয়া গেলেন।

জানালা দিয়া বিদ্যুতের আর এক ঝলক আলো আসিয়া মুক্তোর সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া গেল। বলরাম স্পষ্ট দেখিলেন, আসন্ন মাতৃত্বের স্নিগ্ধ কোমল একটা শ্রী-সম্পাতে সে যেন অভিনব হইয়া

উঠিয়াছে। তাহার বিশীর্ণ মুখ,তাহার মলিন চক্ষু এবং পূর্বের ব্যবহারগুলি— সব কিছু মিলাইয়া বলরামের যেন কোথাও সন্দেহের আভাসমাত্র আর অবশিষ্ট রহিল না। বিস্ময়ে ভয়ে যেন মূঢ় হইয়া গেলেন তিনি।

চর ইস্‌মাইলের নোনা-মাটিতে ফসল ফলিতে সুরু হইয়াছে। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপাদাপির সঙ্গে সে সত্যটা বলরামের হৃৎপিণ্ডের রক্ত ধারার তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল।

* * *

সন্ধ্যার আগে হইতেই জোহান এই জায়গাটিতে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। চরের দক্ষিণ-দিকে যেখানে পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষটা একটু একটু করিয়া তেঁতুলিয়ার জলে লোপ পাইবার উপক্রম করিতেছে, আর খানিকটা খাড়া পাড়ের ভাঙা গা বাহিয়া রাশি রাশি ঘাসের শিকড় দুলিতেছে, সেইখানে একটা গাছের ছায়াতেই সে অপেক্ষা করিতেছিল। লিসি এখানে আসিবে। সন্ধ্যাটা আর একটু ঘন হইয়া পড়িলে নিশ্চয় আসিয়া পড়িবে সে—এই রকমই কথা আছে।

জায়গাটা পুরোপুরি নিরিবিলি এবং নির্জন। নীচে একটা গাছের সঙ্গে একখানা এক দাঁড়ের ছোট ডিঙি সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেইখানা তাড়াতাড়ি বাহিয়া গেলে তিন চার ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমের চরে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে তাহারা। সেখানে বন্দোবস্ত করাই আছে, তার পর একখানা বড় নৌকা লইয়া সোজা চাঁদপুরের পথে। ওখান হইতে রেলে চাপিয়া চিদম্বরম্ তিনদিনের পথ।

ডি-সুজা অবশ্য টের পাইবে রাতারাতিই। কিন্তু সে টের পাইল তো বড় বহিয়া গেল। হৈ চৈ সে করিবে না, করিয়া লাভও নাই। জোহানের হাতেই ডি-সুজার মারণাস্ত্র রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে যে কোন সময়েই তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারে।

জোহান স্বপ্ন দেখিতেছিল। লিসিকে লইয়া ঘর বাঁধিবে সে। রেলে যদি চাকরী পায়, তবে তো কথাই নাই। লাল-ইঁটের ছোট্ট একটি কোয়ার্টার। বাইরে একফালি সব্জীর বাগান, একটা ছোট মুরগীর খোঁয়াড়। সারাদিন এঞ্জিন চালাইয়া সে যখন কালি-ঝুলি মাখা দেহ লইয়া ঘরে ফিরিবে, সঙ্গে সঙ্গে লিসি হয়তো গরম জল আনিয়া হাজির করিয়া দিবে। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। দুই জনের হাসিতে আনন্দে চমৎকার কাটিয়া যাইবে দিনগুলি।

কিন্তু গঞ্জালেস ?

গঞ্জালেসের কথা ভাবিতেই মাথা গরম হইয়া গেল জোহানের। চেহারা একটু বেশি কটা বলিয়াই কি সে এত প্রিয়পাত্র নাকি? গঞ্জালেসের চাইতে সেই বা এমন কমটা কিসের? তাহার দেহেও তো পর্তুগীজের রক্তই বহিতেছে।

কিন্তু লিসি এখনো আসিতেছে না কেন? জোহান চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, এই তো তাহার আসিবার সময়। তা ছাড়া—

চকিতে তাহার চোখে পড়িল—কিসের একটা প্রত্যাশায় তেঁতুলিয়ার জল যেন থম থম করিতেছে। এত ধীরে ধীরে স্রোত বহিয়া চলিতেছে যে হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে নদীর বুঝি কোনো গতি নাই। দু পাশের গাছ-পালাগুলি যেন ঊর্ধমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

ঝড় আসিতেছে।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে—এ সাধারণ ঝড় নয়। মেঘের কালো স্তূপটাকে ছিঁড়িয়া বিদ্যুতের শিখাটা অত্যন্ত লক লক করিয়া উঠিতেছে। সংকেতটা অশুভ।

কিন্তু লিসি ?

লিসি কি প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে ঠকাইলই শুধু, আসিল না?

—জোহান!

ঠিক সেই মুহূর্তেই লিসি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জোহান আগ্রহভরে তাহাকে কাছে টানিয়া লইতে চাহিল, তুমি এসেছ?

—হাঁ, এসেছি। কিন্তু যাবে কী করে! ঝড় আসছে যে!

—আর তো দেরী করা যায় না লিসি। এখানে এমন ভাবে আর পড়ে থাকা যায় না। চলো ডিঙি ছেড়ে দিই—তারপর—

কিন্তু তারপরে যে কী হইবে সেটা জোহান আর শেষ করিতে পারিল না।

পিছন হইতে ধারালো একটা দায়ের কোপ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জোহানের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং জোহান সেটাকে ভালো করিয়া টের পাইতে না পাইতেই তাহার মাথাটা ছিটকিয়া তিনহাত দূরে চলিয়া গেল।

লিসি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানা রক্তহীন শাদা হইয়া গেছে। অস্বাভাবিকভাবে চিৎকার করিয়া সে বলিল, একি হল?

বর্মীটা হাসিতেই ছিল।

লিসি বলিল, কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।

সে বলিল, না। কিন্তু দরকার ছিল।

লিসি জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ডি-সুজাকে অপমান করার জন্য সে জোহানকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায় ভাবিয়াছিল ঘা কতক মার খাইয়াই শায়েস্তা হইয়া যাক লোকটা। কিন্তু যা ঘটিল তা প্রলয়—আকাশ-পাতাল অরণ্যকে ঝড়ের হুঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া তাহারও পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল।

তখন চারদিক কাঁপাইয়া উপনিবেশের ঝড় সুরু হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার ফণা তুলিয়া তেঁতুলিয়ার জল ভাঙা পাড়ের উপর আসিয়া ছোবল্ মারিতেছে—চর ইস্মাইলের নারিকেল আর সুপারির বন দিক দিগন্তব্যাপী এই উৎসবের বিরাট আয়োজনে যোগ দিয়াছে। দক্ষিণ হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ঝোড়ো বাতাসকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া ভাসিয়া গেল—বরিশাল গান গর্জন করিতেছে।

* * * *

লিসি যখন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল—তখন কালো অন্ধকারে ঝোড়ো নদীর উপর পাল তুলিয়া বর্মীদের বজরা উড়িয়া চলিয়াছে।

মাথার উপর একটা কালো লণ্ঠনের আলো বজরার সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। লিসি চোখ মেলিয়া ডাকিল, ঠাকুর্দা!

বর্মীটা হাসিল।

—তোমার ঠাকুর্দাকে জোহানের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সে বেঁচে থাকলে আমরা সবাই ধরা পড়তুম। চর ইস্মাইলের ব্যবসা আমরা তুলে দিলুম।

—আর আমি? আমি?

লিসি প্রাণপণে উঠিয়া বসার চেষ্টা করিল।

—গঞ্জালেস্ যা করত তাই করেছি। আমরাও তো বীরপুরুষ—কাজেই তোমাকে বোটে তুলে নিয়ে এলুম। ভালো করি নি?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লিসির জগৎ ক্রমশ বিন্দুবৎ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ফুলিয়া উঠিয়াছে বজরার পাল। নদীর কালো জল বিদ্যুতের আলোয় যেন সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ দাঁত মেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে অট্টহাসি করিতেছে। তিন শতাব্দী আগে বড় বড় কামান

লইয়া হার্মাদদের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নোনা-মোহনায় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, তাহার জের আজও মিটিয়া যায় নাই। দেশ-দেশান্তর কাল-কালান্তর পার হইয়া তাহারি নিঃশব্দ ধারা বহিয়া চলিতেছে। বর্বরতা দিয়া যে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছে, বর্বরতাতেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে আর একদিন।

কেবল পোস্ট অফিসের কাঁচের দরজাটার ফাঁক দিয়া কেয়ামদ্দী বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। হরিদাস সাহার নৌকায় এখন তেঁতুলিয়ায় পাড়ি জমাইতেছে। এত বাতাসের ঝাপ্টায় সে নৌকা ও-পারে গিয়া পৌছিবে কিনা কে জানে।

হয়তো পৌছিবে না। কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়! বসন্ত যেখানে সুন্দরের তপস্যায় ধ্যান করিতে বসে নাই—যেখানে সে মুক্ত-জটা উড়াইয়া তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে; যেখানে কস্তূরীর মৃদু সুগন্ধিকে ভীরু প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে আহুতি দিয়া প্রখর বহ্নি-শিখায় কামনার যজ্ঞ চলিতেছে—সেখানে সামঞ্জস্যই সব চেয়ে বড় কথা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্ন লইয়া পৃথিবী যেখানে নতুন করিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতে চায়—সেখানে পাওয়া কিংবা হারাণো সব সমান হইয়া গেছে।

উপনিবেশের বর্বর যৌবন এমনি করিয়াই পূর্ণতার, প্রবীণতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে।



প্রথম পর্ব সমাপ্ত



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬